هل جزاء الإحسان إلا الإحسان

ইসলামে হযরত আবু তালিবের অবদান

মোঃ মুকুল নসির

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

আল্লাহর নামে (শুরু করছি) যিনি অতিশয় দয়ালু (সাধারণভাবে সবার জন্যে) এবং পরম করুণাময় (বিশেষ কিছু ব্যক্তির জন্যে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে)

ইসলামে হযরত আবু তালিবের অবদান

[এহসানের প্রতিদানে এহসান ছাড়া আর কী হতে পারে? (৫৫:৬০)]

লেখক : **মোঃ নুরুল মনির**

[কলামিস্ট, গবেষক ও ইসলামি চিন্তাবিদ]

মুঠোফোন : ০১৬৮০০৪২৯৬৯

সম্পাদনায় : **মকবুল হোসেন মজুমদার**

(সম্পাদনা সহকারী, দৈনিক ইনকিলাব)

আলে রাসূল পাবলিকেশন্স

বাসা # ২১, রোড # ১, আরাম মডেল টাউন,

বসিলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

০১৯৭৩৩৬৪৫২৯, ০১৭৭৬০৬০৬৭৬

E-mail: ale.rasul@outlook.com

AhlulbaytBanglaBooks.wordpress.com,By:AwliyaLink1214@gmail.com

ইসলামে হযরত আবু তালিবের অবদান

[এহসানের প্রতিদানে এহসান ছাড়া আর কী হতে পারে? (৫৫:৬০)]

লেখক : **মোঃ নুরুল মনির**
[কলামিস্ট, গবেষক ও ইসলামি চিন্তাবিদ]

সম্পাদনা : **মকবুল হোসেন মজুমদার**
[সম্পাদনা সহকারী, দৈনিক ইনকিলাব]

স্বত্ব : **লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত**

প্রকাশকাল : **একুশে বইমেলা ২০১৪**

প্রচ্ছদ: **এম. এন. মনির**

প্রকাশনায় : **আলে রাসূল পাবলিকেশন্স**
প্লট-২১, রোড-১, আরাম মডেল টাউন, বসিলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
E-mail: **ale.rasul@outlook.com, 0177606076, 01973364529**

পরিবেশনায় :
র‍্যামন পাবলিশার্স, আলী রেজা মার্কেট,
২৬, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ৯৫১৫২২৮
সদর প্রকাশনী, ইসলামি টাওয়ার (৩য় তলা),
১১, ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন: ৭১২৪৮১২

মূল্য : **৳ ১২০.০০**

Islamay Hazrat Abu Talib-er Abodan
-by **MD. Nurul Monir,**
Edit by **Mokbul Hossain Mojumder**
Published by **Ale Rasul Publications**, Plot-21, Road-1
Aram Model Town, Bosila, Mohammadpur, Dhaka-1207
Phone: **01776060676, 01973364529**
E-mail: **ale.rasul@outlook.com**
Price: **Tk. 120.00**

AhlulbaytBanglaBooks.wordpress.com,By:AwliyaLink1214@gmail.com

উৎসর্গ

মহান আল্লাহ পাকের অসীম করুণায় লেখা এ বইটি ইমামতের ধারার সর্বশেষ ইমাম, মহাকালের ত্রাণকর্তা, আল্লাহর মনোনীত জীবন্ত প্রতিনিধি, বাকীয়াতুল্লাহ, আল-কায়েম, আল-মুনতাজার, আল-মুনতাক্বীম, যাঁর আগমণে সমগ্র বিশ্ব শোষণ, নির্যাতন, অত্যাচার, নীপিড়ন, দুর্নীতি ধোঁকা ও বৈষম্য মুক্ত হবে। যিনি গড়ে তুলবেন অন্ধকার ও কুসংস্কারমুক্ত বিশ্ব। সেই মহান **ইমাম মাহ্দী (আ.)-**এর নামে উৎসর্গ করা হলো –আমিন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি সর্বপ্রথমে কৃতজ্ঞতার সাথে শুকরিয়া আদায় করছি পরম করুণাময় আল্লাহ রব্বুল আলামিনের যাঁর অপার মহিমায় আমার মতো নগণ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তি মহান আল্লাহর মনোনীত নবী মোহাম্মদ (সা.) যিনি সর্বজ্ঞানের নগরী, তাঁর আপন চাচা ও জ্ঞান নগরীর দরজা হযরত আলীর পিতা হযরত আবু তালিবের ওপর একটি বই লেখার তৌফিক দান করেছেন। আমার সেই সকল ভাই, বন্ধু ও শুভাকাঙ্খি যাদের উৎসাহ উদ্দীপনা ও সহযোগিতায় আমি এ কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি। সর্বজনাব ভাই ইরশাদ আহ্মেদ, মাওলানা স্যাইয়েদ নাকী ইমাম রিজভী, মাওলানা হাশেম আব্বাস, মাওলানা মোবারক সালমান, মাওলানা আমানুল্লহ কাতিব, মুহাম্মদ ইরফানুল হক, ড. জহির উদ্দিন মাহমুদ, শামীম হায়দার, রাশেদ হায়দার, ওয়াকার হোসেন, রফিকুল ইসলাম, মোঃ শাজাহান, শাহ কফিল উদ্দিন, রফিক উল্যাহ চৌধুরী, আবু জাফর মণ্ডল, রাজু আহ্মেদ, তারিফ হোসেন রানা, ওবায়দুর রহমান, আকবর হোসেন, আনোয়ার হোসেন, সাফদার ইমাম, মোঃ শাহেদ, শাকিল আহ্মেদ, জাকির আলী, রাসেদুল ইসলাম, মারুফ হোসেন, হারুন অর-রশিদ ও শাহবাজ আহম্মেদ সহ দাওয়াতী মিশনের সকল ভাইদের জন্য রইল সালাম ও শুভেচ্ছা, -লেখক।

সূচী

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	০৯
২	হযরত আবু তালিবের পরিচয়	১৩
৩	আব্দুল মোতালিবের দৃষ্টিতে হযরত আবু তালিব	১৫
৪	পবিত্র কাবার দায়িত্ব গ্রহণ ও আরবে হযরত আবু তালিবের প্রভাব	১৬
৫	ব্যবসায়ী আবু তালিব ও কিশোর নবী মোহাম্মদ (সা.)	১৯
৬	হযরত আবু তালিবের নিকট কাফের সর্দারদের অভিযোগ	২১
৭	মোহাম্মদ (সা.) আবু তালিবের ইয়াতিম	২৪
৮	ইসলাম প্রচারের পূর্বে মোহাম্মদ (সা.)	৩২
৯	নবী মোহাম্মদ (সা.)-এর বিবাহ পড়ান হযরত আবু তালিব	৩৪
১০	আধ্যাত্মিক সাধনায় মোহাম্মদ (সা.)	৪০
১১	শেবে আবু তালিব-এ আশ্রয়	৪৪
১২	অসুস্থ চাচার পাশে মোহাম্মদ (সা.)	৪৯
১৩	হযরত আবু তালিবের ম্যাইয়াতের গোসল ও জানাযার নামাজ পড়ান মহানবী (সা.)	৫২
১৪	শাজারায় আবু তালিবই শাজারায়ে মোহাম্মদ (সা.)	৫৪
১৫	হযরত আবু তালিব-এর নামে বিভ্রান্তি প্রচারের কারণসমূহ	৬১
১৬	হাদীসে দ্বাহদ্বাহ'র পর্যালোচনা	৬৫
১৭	প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা	৭২
১৮	মুসলমানদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের কিছু আয়াত	৭৬
১৯	হাদীসে রাসূল (সা.)	৮৩
২০	'জ্ঞান নগরীর দরজা' হযরত আলী (রা.)-এর কিছু বিখ্যাত উক্তি	৮৬

ভূমিকা

মহান সৃষ্টিকর্তার নামেই শুরু করছি, পবিত্র কোরআনের মাধ্যমেই জানতে পেরেছি আল্লাহ পাকের মনোনীত দ্বীন হলো 'ইসলাম'[১]। এই ইসলামকে যিনি সমগ্র বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব নবী-রাসূলগণের সর্দার হযরত মোহাম্মদ (সা.)। যে নবী (সা.)-এর আগমণ না হলে আমরা মহান আল্লাহ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারতাম না, জানতে পারতাম না কোরআন সম্পর্কে, জানতে পারতাম না দ্বীন সম্পর্কে, এমনকি জানতে পারতাম না আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও। তাহলে বিষয়টি পরিষ্কার যে, নবী (সা.) সমগ্র দুনিয়ার মানুষকে জাহেলী যুগের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে গেছেন। আর সেই জাহেলী ভাব যদি এখনো মুসলমানদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়, তবে কি আমরা ভেবে নেব যে, কোরআনের আলো যাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি তারা কি আজও অন্ধকারে নিমজ্জিত?

এমনই অসংখ্য অমিল অসংগতিপূর্ণ বিষয় বরাবরই আমাদের অন্তরকে প্রশ্নবিদ্ধ করে চলছে। এসকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার জন্যই আমি বিভিন্ন সময়ে স্বনামধন্য আলেম-ওলামা ও বুজর্গগণের স্মরণাপন্ন হয়েছিলাম। কিন্তু যথাযথ উত্তর না পাওয়ার কারণেই পবিত্র কোরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাসের গবেষণামূলক অধ্যয়নে রত হই। অতঃপর সত্য উন্মোচনে কিছু লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। যে প্রশ্নগুলো আমাকে সদা বিব্রত করত, তার কিছু অংশ পাঠকের উদ্দেশে বর্ণনা করছি। যেমন: পবিত্র হাদীস-আল-কিসায় নবীকন্যা ফাতেমা যাহ্‌রা (সা.আ.) থেকে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী বর্ণনা করেন। মহান আল্লাহ পাক বলেছেন: "যদি আমি মোহাম্মদকে সৃষ্টি না করতাম তবে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তথা কোনো কিছুই সৃষ্টি করতাম না।" [২]

তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, নবী (সা.) না হলে তো আমরা আল্লাহর পরিচিতি, ইসলাম কিংবা মুসলমান-এর কোনটাই পেতাম না। তাহলে যিনি বা যাঁরা নবী (সা.)-কে লালন-পালন করেছেন, তারা তো ইসলামকেই লালন-পালন

---

[১] ِنَّ الدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلإِسْلاَمُ [সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৯]

[২] সহীহ মুসলিম, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৩; সহীহ তিরমিযী, খণ্ড-১২, পৃ-৮৫।

করেছেন। যাঁরা নবী (সা.)-কে আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁরা তো ইসলামকেই আশ্রয় দিয়েছেন। যারা নবী (সা.)-এর জন্য যুদ্ধ করেছেন, তাঁরা তো ইসলামের জন্যই যুদ্ধ করেছেন। আর যে মহিয়সী নারী নিজের সমস্ত ধন-সম্পদ নবী (সা.)-এর দ্বীন রক্ষায় বিলিয়ে দিয়েছেন, তিনি তো ইসলামকেই সাহায্য করেছেন এবং দ্বীন ইসলামকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই মহান প্রভু তাঁদের সেই অবদানের প্রতিদান দিতে ও কার্পণ্য করেননি। পবিত্র কোরআনের সূরা আদ-দোহার ৬ ও ৮ নং আয়াতে ঐসকল মুমিন-মুমিনাতের কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের কাজকে প্রভু নিজের কর্ম হিসেবে প্রকাশ করেছেন। রব্বুল আলামীন বলছেন :

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَىٰ

وَوَجَدَكَ عَآئِلاً فَأَغْنَىٰ

“তিনি কি আপনাকে এতিম রূপে পাননি? অতঃপর আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব রূপে, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন।”[৩]

যদি আমরা উল্লিখিত আয়াতসমূহের গভীরে প্রবেশ করি এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট মিলিয়ে দেখি তবে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে নবী (সা.)-কে এতিম অবস্থায় আশ্রয় দিয়েছেন দুই মহান ব্যক্তি। একজন তাঁর দাদা আবদুল মোতালিব, অপরজন চাচা আবু তালিব। আর নিঃস্ব অবস্থায় অভাবমুক্ত করেছেন বিবি খাদীজাতুল কোবরা। এই তিন মুমিন-মুমিনার কর্মকাণ্ড এতোটাই প্রশংসনীয় যে, তাঁদের কৃতকর্মকে আল্লাহ পাক নিজ কর্ম বলে স্বীকৃতি প্রদান করছেন।

তাহলে মূল প্রসঙ্গে আসি, আমাদের সমাজের সেই সব আলেম যারা তাদের ওয়াজ-মাহফিল কিংবা লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন, “নবী (সা.)-এর চাচা হযরত আবু তালিব নাকি ঈমান আনেননি। নবী (সা.) বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। এমনকি তিনি চাচাকে ঈমান আনার জন্য কানে কানেও আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু চাচা নাকি ঐ অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন।” তাহলে প্রশ্ন থেকেই যায় ইসলামের জন্য যিনি অসংখ্য ত্যাগ-তিতীক্ষা ও অবদান রেখে গেছেন। তার পরেও কেন তাঁর বিরুদ্ধে এই প্রচার প্রচারণা। আর যারা তা করছেন তারাই বা কোন ইসলাম প্রচার করছেন?

[৩] মাআরেফুল কোরআন, মুফতি মোঃ শফি, অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

তাই সেই মুহসিনে ইসলাম হযরত আবু তালিব, ইসলামের জন্য যে এহসান করেছেন তার কিছু অংশ আমি পাঠকের সামনে তুলে ধরছি। মহান খোদার একত্ববাদের প্রথম ঘোষণার সকল ব্যবস্থা হাশেমি বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র এই আবু তালিবই সর্বপ্রথম 'দাওয়াত-এ-জুলআসিরা'-র মাধ্যমে সুসম্পন্ন করেছিলেন। সমগ্র আরবের কাফের সর্দারদের উত্তম আপ্যায়নের মাধ্যমে তিনি মোহাম্মদ (সা.)-এর খোদায়ী মিশন ও একত্ববাদের ঘোষণার সকল বন্দোবস্ত করেছিলেন। পরপর দুই দিন কাফের সর্দারেরা ভোজন শেষে চলে যায়। তৃতীয় দিন হয়রত আবু তালিব তরবারি উন্মুক্ত করে বলেছিলেন, "হে সর্দারগণ তোমরা প্রত্যেকেই যার যার অবস্থানে অপেক্ষা করো যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ভাতিজা মোহাম্মদ তাঁর বক্তব্য শেষ না করে"। কাফেরেরা সেদিন আবু তালিবের নির্দেশ অমান্য করার সাহস পায়নি।[৪]

ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে ঐ দিনই আল্লাহর রাসূল (সা.) প্রকাশ্যে জনসম্মুখে একত্ববাদের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "শোনো হে সর্দারগণ! আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি আমাদের ও তোমাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যেসকল দেব-দেবীর পূজা করছ তা তোমাদের কোনো কল্যাণে আসবে না। কোনো দেব-দেবী আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়। এগুলো তোমাদের বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষদের সৃষ্টি। আল্লাহর সমকক্ষ কোনো শক্তিই নেই। তিনি সর্বশক্তিমান। আমি তার দাসদের অন্যতম। আর আজকের দিনে আল্লাহর কাজে যে আমাকে সাহায্য করবে সে হবে আমার ওয়াসী, আমার বন্ধু, আমার সাহায্যকারী ও আমার ভাই।" তখন উপস্থিত লোকজনের মধ্য থেকে হযরত আবু তালিবের কিশোর পুত্র হযরত আলীই নবী (সা.)-এর সাহায্যকারী হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করে দাঁড়িয়েছিলেন। নবী (সা.) তাঁকে বসার জন্য ইঙ্গিত করলেন। নবী (সা.) একই কথা তিনবার উচ্চারণ করে দেখতে চেয়েছিলেন কোরাইশ সর্দারদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর সাহায্যকারী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন কি না? কিন্তু না ঐ তিনবারই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন হযরত আবু তালিবেরই সন্তান আট বছরের কিশোর আলী। আর ঐ সভাতেই নবী (সা.) তাঁর ওয়াসীর ঘোষণা প্রদান করেন, শুধু দুনিয়াতে নয় আখেরাতের জন্যেও।

[৪] কামিল ইবনে আসির, খণ্ড- ২, পৃ-৪১; আবু তালিব মুমিনে কুরাইশ, পৃ-১৫০

পাঠকের অবগতির জন্য আরো কিছু বিষয় আমি তুলে ধরছি। শুধু যে হযরত আবু তালিব এবং তাঁর পুত্র আলী, নবী (সা.)-কে ভালোবাসতেন তা কিন্তু নয়। হযরত আবু তালিবের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও নিকট আত্মীয়দের মধ্যে এমন কোনো সদস্য ছিলেন না যে, এক মুহূর্তের জন্যও মোহাম্মদ (সা.)-কে শত্রুদের সম্মুখে একা ছেড়ে গেছেন। এমনিভাবে হযরত আবু তালিব ও তাঁর পরিবার পরিজন ইসলামের নবী (সা.)-এর সাহায্যকারী ছিলেন মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত।

মক্কার কাফেররা যখন মোহাম্মদ (সা.)-কে লোভ-লালসা দেখানোর পরেও ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হলোনা এবং হাশেমিদের সাথে যুদ্ধেও মোকাবিলার সাহস পাচ্ছিল না। তখন তারা নতুন কৌশল অবলম্বন করল। মোহাম্মদ (সা.)-কে আশ্রয়দানকারী হযরত আবু তালিব ও তাঁর পরিবার পরিজনদেরকে একঘরে করে দেয়ার নীতি অবলম্বন ও সমাজ থেকে তাঁদেরকে বয়কট করার ঘোষণা এবং কাবার দেয়ালে কাফের সর্দাররা তাদের স্বাক্ষরিত শপথপত্র ঝুলিয়ে দিল।

এমনসব প্রতিকূল পরিবেশ ও অবরোধ সত্ত্বেও হযরত আবু তালিব, মোহাম্মদ (সা.)-এর ওপর বিন্দুমাত্র আঁচড় যেন না আসে সে ব্যবস্থাই করেছিলেন। তিনি ভাতিজাকে নিয়ে সপরিবারে মক্কার অদূরে পাহাড়ের পাদদেশে একটি উপত্যকায় অবস্থান নিলেন। আর এই অবস্থার অবসান ঘটতে সময় লেগেছিল তিন বছরেরও অধিক সময়কাল। আবু তালিবের পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থানের ঐ স্থানটি আজও ইসলামের ইতিহাসে ‘শেবে আবু তালিব’ নামে পরিচিত।

হযরত আবু তালিব নবী (সা.) ও ইসলামের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণে সকল কাজের আন্‌জাম দিয়ে গেছেন। তদুপরি যেসব আলেম এই মহান ব্যক্তির সৎ কাজের স্বীকৃতির পরিবর্তে তাঁর ঈমান না আনার তির ছুঁড়ছেন। তারা কি হযরত আবু তালিবের এহসানের পরিবর্তে তাঁর প্রতি জুলুম করছেন না?

অথচ মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের সূরা আর-রহমানের ৬০নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন :

هَلْ جَزَآءُ ٱلإِحْسَانِ إِلاَّ ٱلإِحْسَانُ

অর্থাৎ **এহসানের প্রতিদানে এহসান ছাড়া আর কি হতে পারে?**

উক্ত বইটিতে যে সকল ঐতিহাসিক বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার তথ্য সূত্র সমূহ সংখ্যা নির্ধারণ পূর্বক বিভিন্ন পাতার নিম্নাংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আবু তালিবের পরিচয়

নবী ইব্রাহিম (আ.)-এর পুত্র নবী ইসমাইল (আ.)-এর বংশ ধারায় জনাব আবদে মানাফ, হাশেম তদীয় পুত্র আবদুল মোতালিব ও তাঁর পুত্র হযরত আবু তালিব। মহান আল্লাহ পাক মানবজাতিকে অন্ধকারমুক্ত করে আলো দান করার নিমিত্তে তাঁর পক্ষ থেকে রেসালাতের যে ধারার প্রবর্তন করেন সেই ধারাবহিকতায় নবী আদম (আ.) থেকে হযরত মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। এখানে জানা থাকা দরকার যে, উল্লিখিত ধারার অনেকেই ছিলেন নবী-রাসূলগণের উত্তরাধিকারী বা 'ওয়াসী' পদে মনোনীত। আবার কারো কারো মনোনয়ন ছিল কাবা ঘরের মোতাওয়াল্লী বা তত্ত্বাবধায়ক পদে। যেহেতু মহানবী (সা.)-এর পরবর্তিতে আর কোনো নবী নেই, তাই মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁর প্রচলিত ধারাকেই 'ইমামত'-এর ধারায় প্রবাহিত করে কেয়ামত পর্যন্ত প্রবহমান রেখেছেন।

আর সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এধারায় যাঁরা নেতৃত্ব দিবেন তাঁরাই হচ্ছেন 'ইমাম'। এই ইমামদের শুরু হযরত আলী থেকে এবং শেষ ইমাম মাহ্দী (আ.) পর্যন্ত। আবু তালিব এমনই এক ভাগ্যবান ব্যক্তি যাঁর বংশে আল্লাহর মনোনীত 'নবী' এবং 'ইমাম' দুটিই রয়েছে। আর মহান সৃষ্টিকর্তা এই বংশের গুণিজনদের হাতেই রেখেছেন কাবার কর্তৃত্ব।

বরাবরই কাবার কর্তৃত্ব হাশেমিদের হাতে ছিল, আবু তালিবের পূর্বে তাঁর পিতা আবদুল মোতালিব, তাঁর পূর্বে তাঁর দাদা হাশেম এমনিভাবে তাঁদের পূর্ব পুরুষগণ। কথিত আছে একবার দাদা হাশেমের সময় যখন আরবে দূঃর্ভিক্ষ দেখা দিল তখন তিনি দূঃর্ভিক্ষ মোকাবিলায় খাদ্য সরবরাহ করে আরব-অনারব সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। আর এই অবস্থা চলেছিল প্রায় তিন মাসব্যাপী।[৫]

দাদা হাশেমের মতোই হযরত আবু তালিব ছিলেন জনদরদী, কোমলমতি ও দানশীল। তৎকালীন আরবে গোত্রদ্বন্দ্ব আর বাহুশক্তির প্রদর্শন ছিল যত্রতত্র। কিন্তু হাশেমিদের সম্মুখে তরবারি উন্মুক্ত করার সাহস সকলের ছিল না। আর

[৫] সিরাতুন নবী, আল্লামা শিবলী নোমানী, খণ্ড-১, পৃ-১২০।

যখনই কোনো গোত্রীয় সমস্যা সমাধান হচ্ছিল না, তখন সমাধানের একটিমাত্র উপায় ছিলেন হযরত আবু তালিব। জীবনে বহুবার তিনি আরব অনারবদের নানামুখি সমস্যার সমাধান করেছেন। একারণেই সমগ্র আরবে তাঁর প্রভাব বিস্তার লাভ করে। পেশীশক্তির চেয়ে কৌশল অবলম্বনে সমাধানের পথ বের করায় তিনি ছিলেন এক অনবদ্য কিংবদন্তি।

হযরত আবু তালিব জীবনে একমুহূর্তের জন্যেও কোনো মূর্তি কিংবা দেব-দেবীর স্মরণাপন্ন হয়েছেন এমন প্রমাণ পৃথিবীতে কোন লেখক ঐতিহাসিক কিংবা উপন্যাসিক উপস্থাপন করতে সক্ষম হননি। অথচ যারা অনায়াসে বলে ফেলেন, "আবু তালিব ঈমান আনেননি"। তারা কি নিজেদের ঈমান পরিমাপের কোনো মানদণ্ড স্থাপন করেছেন?

যে মহান ব্যক্তির সৎকর্মকে আল্লাহ পাক নিজের কর্ম বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন অথচ অধিকাংশ মুসলমান তা ভুলে গেলেন। আল কোরআনের সূরা আদ-দ্বোহা, ৬ নং আয়াতটির প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করুন :

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَىٰ

"তিনি কি আপনাকে এতিম অবস্থায় পাননি, অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন"

আব্দুল মোতালিবের দৃষ্টিতে হযরত আবু তালিব

ইতিহাসের নানা পর্যায়ের দালিলিক প্রমাণের দিকে দৃষ্টি দিলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, কোনো কোনো স্বচ্ছ অন্তরের অধিকারী ও ভবিষ্যৎ প্রবক্তা ব্যক্তিবর্গ আব্দুল মোতালিবকে মহানবী (সা.)-এর উজ্জ্বল ভবিষ্যত এবং তাঁর নবুওয়্যত সম্পর্কে অবহিত করেন।

যেমন, সাইফ ইবনে জিইয়াজান যখন আবিসিনিয়ার শাসনভার গ্রহণ করেন তখন আব্দুল মোতালিব এক প্রতিনিধি দলের প্রধান হয়ে তার দরবারে উপস্থিত হন। বাদশাহ কিছু মনোজ্ঞ ও বাগ্মীতাপূর্ণ ভাষণের পর তাঁকে (আব্দুল মোতালিবকে) সুসংবাদ দেন যে, আপনার বংশে এক সম্মানিত নবী (সা.)-এর আগমণ ঘটবে। অতঃপর তিনি মহানবী (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন: "তাঁর নাম হবে মুহাম্মাদ। (শৈশবেই) তাঁর বাবা-মা মৃত্যুবরণ করবেন এবং তাঁর দাদা ও চাচা তাঁর দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।"

তিনি বিশ্বনবী (সা.)'র আরো কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পর আব্দুল মোতালিবকে বলেন: "নিঃসন্দেহে আপনি তাঁর পিতামহ" (সিরায়ে হালাবি)

আব্দুল মোতালিব এ সুসংবাদ শোনার পর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে উক্ত পবিত্র শিশু সম্পর্কে বললেন: "আমার অতি প্রিয় এক সন্তান ছিল, তাঁর নাম ছিল আব্দুল্লাহ। এক মহিমান্বিত রমণীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলাম যার নাম, আমেনা বিনতে ওয়াহাব ইবনে আব্দে মানাফ ইবনে যোহরাহ। সেই রমণী একটি জ্যোতীর্ময় পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় যার নাম রেখেছি মুহাম্মাদ। কিছু কাল পর তাঁর পিতা-মাতা ইন্তেকাল করলে আমি ও তাঁর চাচা (আবু তালিব) তাঁর দেখাশুনার দায়িত্ব নেই।" (সিরায়ে হালাবি)

এটা স্পষ্ট যে, আব্দুল মোতালিব ও এতিম শিশু মোহাম্মদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই তিনি নিজের পর এই শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্ব নিজের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান আবু তালিবের হাতে অর্পণের উদ্যোগ নেন এবং অন্যদেরকে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন।

এতে বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, আবু তালিব নিজের একত্ববাদী মু'মিন পিতার দৃষ্টিতে ঈমানের ঐ উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই আব্দুল মোতালিবের দৃষ্টিতে তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে কেবল তিনিই রাসূল (সা.)-এর লালন-পালনের জন্য যোগ্য ও বিবেচিত হলেন।

পবিত্র কাবার দায়িত্ব গ্রহণ
ও
আরবে হযরত আবু তালিবের প্রভাব

হযরত আবদুল মোতালিব ইন্তেকালের পূর্বেই তাঁর পুত্রগণের মধ্যে থেকে হযরত আবু তালিবকে কাবার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে মনোনীত করেন। তিনি জানতেন খোদার ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের গুরু দায়িত্ব বহন করার ক্ষমতা একমাত্র আবু তালিবেরই রয়েছে। মহানবী (সা.)-এর দাদা হযরত আবদুল মোতালিব ছিলেন মহান খোদার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার একনিষ্ঠ সৈনিক। যার প্রমাণ এইযে, তিনি তাঁর প্রিয় সন্তানের নাম রেখেছিলেন 'আবদুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর দাস। যিনি ছিলেন নবী (সা.)-এর পিতা। শুধু তাই নয় আবদুল মোতালিব এটাও জানতেন যে, এই শিশু মোহাম্মদই একদিন সমগ্র বিশ্বে সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত দ্বীনের প্রসার ঘটাবেন। তাই তিনি ইন্তেকালের পূর্বে আবু তালিবকে সতর্ক করে বলেছিলেন, "হে পুত্র! মনে রেখো, মোহাম্মদ হচ্ছে আমাদের বংশের গর্বের প্রতীক। তাঁর চালচলন অন্য সকলের থেকে আলাদা। তাঁকে সর্বসময়ে চোখে চোখে রেখো। একদিন তাঁর সুনাম সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে অথচ তাঁর শত্রুর সংখ্যাও কম হবে না।"

পিতার এই সতর্কবাণী হযরত আবু তালিব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। হযরত আবু তালিব নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সদা সচেতন ছিলেন। পবিত্র কাবার মোতাওয়াল্লী বা তত্ত্বাবধায়ক মনোনীত হওয়ায় তিনি মক্কাবাসী তথা আরব অনাবর সকলের নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

কথিত আছে ৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে অনাবৃষ্টির কারণে মক্কায় দুঃর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মক্কাবাসীরা হযরত আবু তালিবের কাছে এসে বললেন, "হে আবু তালিব, আপনি আমাদের বুজুর্গ ও পবিত্র ঘরের মোতাওয়াল্লী। কাবায় গিয়ে দোয়া করুন যেন বৃষ্টি হয়। আল্লাহর কৃপায় আমরা এই অবস্থার অবসান চাই।" হযরত আবু তালিব শিশু-কিশোর ও কোরাইশ লোকজনদের নিয়ে কাবায় গেলেন। সাথে ভাতিজা কিশোর মোহাম্মদকেও নিলেন। উপস্থিত লোকজনের সম্মুখে মোহাম্মদ (সা.)-এর হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে বললেন, "হে মোহাম্মদ! প্রার্থনা কর রবের কাছে যেন এই অবস্থার অবসান ঘটে"।

নবী (সা.)-এর হাত আল্লাহর কাছে সকল অবস্থায় গ্রহণযোগ্য, হযরত আবু তালিব তা জানতেন। মুহূর্তের মধ্যে কালো মেঘে আকাশ ছেঁয়ে গেল, বৃষ্টি নেমে এলো। আর এমন বৃষ্টি হলো যে, চারিদিকে কেবল পানি আর পানি। হযরত আবু তালিব জানতেন ভাতিজা মোহাম্মদের হাতের মর্যাদা মহান আল্লাহ পাক অবশ্যই রক্ষা করবেন।[৬]

পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারার **১২৪** নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন :

وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً

قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ

"যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করলেন। তখন আল্লাহ বললেন "নিশ্চয় আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য ইমাম মনোনীত করলাম। তিনি তখন বলেছিলেন তবে কি আমার বংশধরদের জন্যও এ প্রতিশ্রুতি রয়েছে? আল্লাহ বললেন, আমার অঙ্গীকার জালেমদের জন্য প্রযোজ্য নয়"।

উক্ত আয়াতে এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর রেসালেতের ধারা কিংবা আল্লাহর ঘরের কর্তৃত্ব তিনি কোনো জালেম কিংবা কাফেরের হাতে ন্যস্ত করেননি।

মহান প্রভু তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নবী ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশের দু'ধারাতে এ মনোনয়ন অব্যাহত রেখেছেন। একটি নবী ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, জাকারীয়া, মুসা (আ.) থেকে এরূপে নবী ঈসা (আ.) পর্যন্ত। বনী ইসরাইলীদের যত নবী এসেছেন তাঁরা সকলেই পরস্পরের পিতা-পুত্র বা বংশধর। এ ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে নবী ঈসা (আ.) পর্যন্ত। কেননা তিনি কোনো সন্তান রেখে যাননি। আর অপর ধারাটি নবী ইব্রাহীমের পুত্র ইসমাইল (আ.) থেকে প্রবাহিত হয়। এ বংশের ধারাই কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর পূর্বে ও তৎপরবর্তী সময়ে কেয়ামত পর্যন্ত এ বংশের বিনয়ী সন্তানগণ কাবার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত।

হযরত আবু তালিবের প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে মক্কার কাফের সর্দারেরাও ভালোভাবে অবগত ছিল। একবার রাসূল (সা.)-কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। হযরত আবু তালিব শুনেছিলেন কোরাইশ কাফেরেরা তাকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করার পাঁয়তারা করছে। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি অসংখ্য হাশেমি সাহসী যুবকদের

[৬] তারীখে ইসলাম, ১ম খণ্ড, পৃ-৫১-৫২; আল-গাদীর, খণ্ড-৭, পৃ-৩৪৬; বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড-৬, পৃ-২৮৮।

নির্দেশ দিলেন, "নিজেদের পোশাক অভ্যন্তরে তরবারি গোপন রেখে সকল কাফের সর্দারের ওপর নজর রাখার জন্য। যদি মোহাম্মদকে না পাওয়া যায় তবে কারো নিস্তার নেই"। সকল কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে। কেননা মোহাম্মদ (সা.)-এর রক্ত সমগ্র কোরাইশদের রক্তের চেয়ে অধিক মূল্যবান।

মোহাম্মদ (সা.)-কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না শুনে কাফেররাও বিচলত হয়ে পড়ে। অবশেষে বিকেল বেলায় হযরত আবু তালিব নবী (সা.)-কে পাহাড়ের ঢাল থেকে খুঁজে বের করেন। তিনি লোকালয় ছেড়ে নীরবে নিভৃতে ঐশী ধ্যানের লক্ষ্যে সেই স্থানে গিয়ে ছিলেন। মোহাম্মদ (সা.)-কে সাথে নিয়ে হযরত আবু তালিব কোরাইশদের উদ্দেশে বলেন, "তোমরা কি জানো আমাদের ইচ্ছা কী ছিল? যদি তোমরা মোহাম্মদকে হত্যা করতে তাহলে তোমাদের মধ্যেকার একজনও আজ জীবিত থাকত না।"

তারপর নিজদলীয় যুবকদের ধারালো তরবারিগুলো প্রদর্শনের হুকুম দিলেন, যাতে কোরাইশরা হযরত আবু তালিবের প্রস্তুতি সম্পর্কে বুঝতে পারে। অসংখ্য তরবারির ঝলকানি দেখে সর্দারদের চেহারা মলিন হয়ে গেল। ভাটা পড়ে যায় তাদের উদ্যমে, আবু জাহেল হতভম্ব হয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করে।[৭]

[৭] আল-গাদীর, খণ্ড-৭, পৃ:-৩৪৯-৩৫২; শায়খুল আবতাহ, পৃ-২৬-২৮।

ব্যবসায়ী হযরত আবু তালিব
ও
কিশোর নবী মোহাম্মদ (সা.)

হযরত আবু তালিব তাঁর পিতা আব্দুল মোতালিবের নিকট থেকে ভাতিজা মোহাম্মদের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্বপ্রাপ্তির পর থেকে কখনও তাঁকে একা ছেড়ে দেননি। সার্বক্ষণিক নিজে অথবা তাঁর পরিবারের লোক সমেত ভাতিজাকে আগলে রেখেছেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন আরবের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। হযরত আবু তালিব নিজের ব্যবসায়িক কাজেও মোহাম্মদ (সা.)-কে সাথে নিয়ে যেতেন। ভাতিজাকে নিয়ে তিনি যতবার ব্যবসয়িক সফরে গিয়েছেন ততবারই অকল্পনীয় সাফল্য তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মোহাম্মদ কোনো সাধারণ মানুষ নহেন।

একবার দামেশকের সন্নিকটে হযরত আবু তালিবের কাফেলা পৌঁছালে, বুহায়রা নামক এক খ্রীষ্টান পাদ্রী ঐ কাফেলার সকলকে তার মেহমান হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তখন ১২ বছরের নবী মোহাম্মদ (সা.)-কে মালামাল রক্ষার প্রহরায় রেখে সকলেই বুহায়রার দরবারে উপস্থিত হলেন। বুহায়রা বললেন, “যাঁর উদ্দেশ্যে আমি আপনাদের আমন্ত্রণ জানালাম তিনিই তো আসলেন না”। বুহায়রা নিজে গিয়ে কিশোর নবীকে স্বসম্মানে নিজ দরবারে নিয়ে আসলেন।

আপ্যায়ন শেষে বুহায়রা সকলের অগোচরে নবী মোহাম্মদ (সা.) ও হযরত আবু তালিবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “হে আবু তালিব আপনি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, আপনার বংশে আল্লাহর মনোনীত শেষ নবী ‘মোহাম্মদ’ রয়েছেন। যিনি আদম সন্তানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনাদের আগমণের বার্তা আমি আগে থেকেই অবগত আছি। কারণ আমাদের ইঞ্জিল কিতাবে মোহাম্মদের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। আর আপনারা যখন আমার এলাকায় প্রবেশ করেন তার পূর্ব থেকেই একখণ্ড মেঘ আপনাদের ছায়া দিয়ে আসছিল। যখন আপনারা সকলে আমার দরবারে এলেন তখনও মেঘটি কাফেলার স্থানে স্থির ছিল। এতে আমি নিশ্চিত হলাম যে, কিতাবে উল্লিখিত নবী মোহাম্মদ এখনও আমার দরবারে উপস্থিত হননি। তাই আমি নিজে গিয়ে নবী আপনাকে নিয়ে আসলাম। আর মেঘ খন্ডটিও আমাদের সাথে চলতে শুরু করল”।

বুহায়রা আরও বললেন, "হে আবু তালিব! আপনি অতি শীঘ্রই দামেস্ক ত্যাগ করুন। কারণ মোহাম্মদের প্রচুর শত্রু রয়েছে। আর হে মোহাম্মদ! আপনি যখন আল্লাহর একত্ববাদের পরিপূর্ণ মিশন শুরু করবেন, তখন যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে আমিও আপনার সাহায্যকারী হবো।" বুহায়রার মুখে ভাতিজার খোদায়ী মিশনের কথা শুনে হযরত আবু তালিব আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন আর ভাবলেন, মহান আল্লাহ তাঁরই বংশকে শেষ নবী (সা.)-এর আগমণের জন্য নির্বাচিত করেছেন। এক অনাবিল স্বর্গীয় প্রশান্তি তাঁর হৃদয় প্রাণে দোলা দিতে লাগল। এই ব্যবসায়িক সফর শেষে হযরত আবু তালিব আরো সতর্ক হলেন। মোহাম্মদ (সা.)-এর আত্মরক্ষায় নিজে এবং তাঁর সন্তানদের সার্বক্ষণিক নিয়োজিত রাখলেন।[৮]

---

[৮] কিসাসুল আরব, পৃ-৯৯-১০০; তাবারি, খণ্ড-২, পৃ-২২-২৪; আস্ সিরাতুল হাশিমীয়া, পৃ-১৯১-১৯৪।

হযরত আবু তালিবের নিকট কাফেরদের অভিযোগ

যে মোহাম্মদ (সা.)-এর শিশু-কিশোর ও যৌবনকাল আরবের কাফের-মুশরিক ও আরব অনারবদের মাঝে অতিবাহিত হয়েছে, যারা তাঁর চরিত্রমাধুরীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁর নাম রেখেছিল 'আল-আমিন' অর্থাৎ সত্যবাদী, যারা মোহাম্মদ (সা.)-এর দেয়া সমাধান মেনে নিত অনায়াসে। মাত্র আট বছর বয়সে যিনি 'হজরে আসওয়াদ' নামক কালো পাথর স্থানান্তর নিয়ে উদ্ভূত গোত্রীয় দ্বন্দ্বের শান্তিময় সমাধান করেছিলেন। পাথরটি চাদরের মাঝখানে রেখে চার গোত্রপতিকে চার কোন ধরার মাধ্যমে তা স্থানান্তর ও নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপনের পরামর্শ প্রদান পূর্বক নিষ্পত্তি করেন। এতে সকলে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল।

আবার সেই কাফেরাই তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ, কুৎসা রটনা ও অস্ত্রধারণ এমনকি তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করে, কারণ ছিল মোহাম্মদ (সা.) তাদের বাপ-দাদার ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলেন। তিনি একাধিক দেব-দেবীর বিপক্ষে ও এক আল্লাহর পক্ষে কথা বলেন। এটাই মোহাম্মদ (সা.)-এর জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রথম অভিযোগ

একবার আবু জাহেল, আবু লাহাব, আবু সুফিয়ান, ওৎবা, শাইবা, প্রমুখ কাফের মুশরিক নেতৃবর্গ জনাব আবু তালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করল যে, "আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ আমাদের বাপ-দাদার ধর্মের বিরোধিতা করছে। এমনকি আমাদের পূজনীয় দেব-দেবী লাত, মানাত ও ওজ্জা মূর্তি সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলছে"। হযরত আবু তালিব তাদের অভিযোগ শুনে শুধু এতটুকু তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি মোহম্মদকে কখনও মিথ্যে বলতে শুনেছ?" সকলে মস্তক অবনত কণ্ঠে স্বীকার করেছিল, "না আমরা শুনিনি"। অতঃপর তিনি বললেন, "তাহলে মোহাম্মদ যে আল্লাহর কথা বলছে তিনি অবশ্যই এক ও অদ্বিতীয় এবং সর্বশক্তিমান আর আমাদের ও তোমাদের পালনকর্তা।" হযরত আবু তালিবের এরূপ বক্তব্য শুনে কাফেররা বিরক্ত হয়ে তাৎক্ষণিক বিদায় নিল।

দ্বিতীয় অভিযোগ

যতই দিন যাচ্ছিল একত্ত্ববাদ ততই প্রসার লাভ করছিল। মোহাম্মদ (সা.)-কে তাঁর কাজ থেকে বিরত রাখার সকল প্রচেষ্টা ও অব্যাহত রয়েছে। তবুও ইসলামকে জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণকারী লোকজনের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণনাশের জন্য বিষ প্রয়োগের চেষ্টাও বার বার ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে কাফের সর্দাররা পুনরায় হযরত আবু তালিবের স্মরনাপন্ন হলো। তারা বললো, "হে আবু তালিব! আপনার মর্যাদা ও ঐতিহ্যের সম্মানে আমরা এতদিন আপনার ভাতিজা মোহাম্মদের কার্যকলাপ অনেক সহ্য করেছি। কিন্তু আমাদের ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। এখন আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম। কেননা, মোহাম্মদ প্রকাশ্যে আমাদের বাপ-দাদার ধর্মের ও দেব-দেবীর বিরোধিতা করছে। আপনি হয় তাকে একাজ থেকে বিরত রাখুন। না হয় তার পক্ষে অস্ত্রধারণ করুন। তরবারির দ্বারাই বিষয়টির ফয়সালা হোক।" একথা শুনে হযরত আবু তালিব বললেন, "মোহাম্মদ কি মানুষদের মন্দ কাজের দিকে আহবান করছে?" হযরত আবু তালিবের এমন কথায় কাফেরেরা হতভম্ব হয়ে ফিরে গেল। আবার হাশেমিদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারনের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ ভেবে তারা অগ্রসর হতে সাহসী হলো না।

তৃতীয় প্রচেষ্টা

বহু বাধা বিপত্তি ও গোপণ ষড়যন্ত্র করেও যখন ইসলামের ক্রমাগত অগ্রযাত্রা ঠেকানো গেল না, তখন কাফের সর্দারেরা লোভ-লালসা ও প্রলোভনের পথ বেছে নিল। আবার তারা হযরত আবু তালিবের স্মরণাপন্ন হলো এবং বলল, "হে আবু তালিব! আমরা আপনার ভাতিজার সাথে এ পর্যন্ত অনেক ভাল ব্যবহার করেছি, আমরা তাকে সমগ্র আরবের নের্তৃত্ব কর্তৃত্ব ও সবচেয়ে সুন্দরী নারী এবং অজস্র ধন-সম্পদ দেয়ারও প্রস্তাব করেছি। বিনিময়ে সে আমাদের বাপ-দাদার ধর্মকে মেনে নিবে। কিন্তু সে আমাদের উপহার ও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। শুধু তাই নয় এখন সে আরও জোরেশোরে প্রকাশ্যে দেব-দেবীর বিরুদ্ধে অপমানজনক কথা বলছে এবং আমাদের বাপ-দাদার ধর্মকে ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করছে। এ অবস্থা আমরা আর চলতে দিতে পারি না। এর পূর্বেও আমরা আপনাকে এ বিষয়ে নালিশ করেছিলাম কিন্তু আপনি আমাদের কথা গ্রাহ্য করেননি। সুতরাং আজই এর সুরাহা করতে হবে। হয় আপনার ভাতিজা মোহম্মদের ধর্ম প্রচার বন্ধ করুন, না হয় তাকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন।"

কাফের সর্দারদের এরূপ বক্তব্যে হযরত আবু তালিব গর্জে উঠে বললেন, "হে সর্দারগণ সুস্পষ্ট ভাবে জেনে রাখো, মোহাম্মদকে সোপর্দ করা তো দূরের কথা কেউ তার চুল পরিমাণ ক্ষতির চিন্তাও করো না। অন্তত আমি যতদিন বেঁচে আছি। আর যদি তা তোমাদের কারো হতে প্রকাশ পায়, তবে তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করা হবে।"

মোহাম্মদ (সা.)-এর জন্য হযরত আবু তালিবের এরূপ দৃঢ় কঠিন অবস্থান কাফেরদের নিরাশ করে দিল। আর ভাতিজাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, "হে মোহাম্মদ! আজ থেকে তুমি একাগ্রচিত্তে আল্লাহর বিধান ও বিষয়াবলির কর্মকাণ্ড প্রকাশ্যে চালিয়ে যাও। আমি কখনও তোমাকে বিচলিত হতে দেব না এবং তোমাকে কাফেরদের হাওলাও করব না। আল্লাহর কসম আমি জানি তোমার দাওয়াত সত্য, তুমি ঐ রবের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ নসিহতকারী ও বিশ্বস্ত। আমি বেঁচে থাকতে কেউ তোমাকে কষ্ট দিতে পারবে না।"[৯]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে উল্লিখিত উক্তির পরেও কি হযরত আবু তালিবের ঈমান আনার প্রয়োজন রয়েছে? আর যাদের তা প্রয়োজন, তারা কি ভেবে দেখেছেন? যে ঈমানী দায়িত্ব হযরত আবু তালিব নবী ও তাঁর ইসলামের জন্য সম্পন্ন করে গেছেন এর কোটি ভাগের এক ভাগও তাদের পক্ষে করা সম্ভব কি?

আমি এখন আমার প্রিয় নবী (সা.)-এর স্পর্শকরা 'হযরে আসওয়াদ' পাথরের অন্ত:নিহীত তথ্য মুমেনীনদের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করছি। উক্ত পাথর নিয়ে চৌদ্দ'শ বছর পূর্বে যে দ্বন্দের উদ্ভব হয়েছিল, নবী (সা.) তা মিটিয়েছিলেন কিশোর বয়সে। আর মহান আল্লাহ পাক তাঁর নবী (সা.)-এর স্পর্শের কারণে এই পাথরকে যে মর্যাদা দান করলেন তা হচ্ছে, সে কেয়ামত পর্যন্ত হাজীদের পাপ মোচন করে যাবে। আফসোস! ঐসকল মুসলমানের প্রতি যারা ভুলে গেলেন আমার নবী (সা.)-এর আট বছর বয়স থেকে শুরু করে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত হযরত আবু তালিবের দেহ, মন, প্রাণ ও সমাজ সংসারে নবী (সা.)-এর স্পর্শ কিংবা ছোঁয়া রয়েছে কত শত কোটি? তাহলে সেই মহান আবু তালিবের মর্যাদা কত উর্দ্ধে তাকি নির্ণয়যোগ্য?

---

[৯] তারিখে ইসলাম, ১ম-খণ্ড, পৃ-৯৩; শারহে নাহজুল বালাঘা, ৩য়-খণ্ড, পৃ-৩০৬; আল কাশশাফ, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৪৮; আল গাদির, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৩৪।

মোহাম্মদ (সা.) আবু তালিবের ইয়াতিম

মহানবী (সা.) জন্মের পূর্বেই পিতাকে হারিয়েছেন। মায়ের কাছে তিনি পিতা আব্দুল্লার ইন্তেকালের কথা জানতে পেরেছেন। ছয় বছর বয়সে তিনি মাতা আমেনার স্নেহ থেকেও বঞ্চিত হন। ফলে তাঁর লালন-পালনের ভার পিতামহ জনাব আব্দুল মোতালিব গ্রহণ করেন। মাত্র দুবছর পর তিনিও এ পৃথীবি ছেড়ে চলে গেলেন। শিশু মোহাম্মদ অসহায় হয়ে পড়লেন। মহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর হাবিবের জন্য নিজ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছেন। আট বছর বয়সে শুরু হলো নবী (সা.)-এর জীবনের এক নতুন অধ্যায়, তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন পিতৃব্য হযরত আবু তালিব।

মোহাম্মদ (সা.)-কে চাচা আবু তালিব ও চাচি ফাতেমা বিনতে আসাদ প্রাণাধিক ভালবাসতেন। মোহাম্মদ (সা.)-কে তিনি কখনো মায়ের শূন্যতা বুঝতে দেননি। নিজেদের সীমাবদ্ধতা থাকলেও মোহাম্মদ (সা.)-কে তা অনুধাবন করতে দেননি। এই মহিমান্বিত পরিবারের অকৃত্রিম ভালবাসা, আদর-যত্ন আর লালন-পালন ও ছত্রছায়ায় প্রিয় নবী (সা.)-এর শিশু, কিশোর ও যৌবনকাল অতিবাহিত হয়েছিল। জীবনের সেই সময়গুলো কত সুখময় ছিল নবী (সা.) তা বুঝতে পেরেছিলেন, যখন মাতৃসুলভ চাচি ইন্তেকাল করলেন। নবী (সা.) সেই মহিয়সী চাচিকে 'মা' বলেই ডাকতেন। তাঁর ইন্তেকালে নবী (সা.) দীর্ঘদিন অশ্রুসজল ছিলেন। হযরত আবু তালিব যেমনি পিতার ন্যায় স্নেহ ভালবাসা দিয়ে নবীকে আগলে রেখেছেন, তেমনি তাঁর ভরণ-পোষণ, পোশাক-পরিচ্ছেদ ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটিয়েছেন অকৃপণ ভাবে। এমনকি নিজের সন্তানের চেয়েও নবীকে দিয়েছেন অগ্রাধিকার। নিজেরা কষ্টে থাকলেও নবী (সা.)-এর কষ্টে থাকা তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

এখানে আমি পাঠকের উদ্দেশ্যে একটি হাদীস উপস্থাপন করছিঃ রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার জান-মাল, ইজ্জত-সম্মান ও সন্তানসন্ততি এবং সকল মানুষের চাইতে আমাকে অধিক ভালবাসে না তার ঈমান পরিপূর্ণ নয়"। উল্লিখিত হাদীসের আলোকে প্রমাণ হয় হযরত আবু তালিব ছিলেন একজন পরিপূর্ণ ঈমানদার। একজন স্নেহবৎসল পিতা, দয়ালু চাচা ও একজন দরদি অভিভাবক। তাঁরা উভয়ই চাচা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র একে অন্যের প্রতি এতটাই

অনুরোক্ত ছিলেন যেন মনে হতো তাঁদের জীবন পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। দেশে বিদেশে হযরত আবু তালিব যেখানেই সফর করতেন নবীকে সাথে রাখতেন। যে কারণে আরবের লোকেরা মোহাম্মদ (সা.)-কে 'আবু তালিবের ইয়াতিম' নামেও ডাকত। ভাতিজাকে কখনও তিনি একা ছাড়তেন না, এমনকি শয়ন কালেও পাশে শোয়াতেন। এরূপে নবী (সা.)-এর ৮ বছর বয়স থেকে ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৭টি বছর তিনি হযরত আবু তালিবের গৃহে অবস্থান করেন।[১০]

আর যেখানে এত বছর নবী (সা.) অবস্থান করলেন, সেখানে যে খাওয়া দাওয়া করেছেন তা নিশ্চই হালাল ছিল। কারণ নবী-রাসূলগণ হারাম খাদ্য গ্রহণ করেন না। তাহলে যারা বলেন, "আবু তালিব ঈমান আনেননি"। তারা নবী (সা.)-কে কোথায় পৌঁছালেন? কারণ পবিত্র কোরআনে সূরা তওবার ২৮ নং আয়াতে আল্লাহ পাক উল্লেখ করছেন :

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

"হে ইমানদারগন! নিশ্চই মুশরিকরা হচ্ছে অপবিত্র"।

তাই ঐ সকল ওলামাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আপনাদের উক্তি সত্য হলে, নবী (সা.) কি ১৭ বছর হালাল খাদ্য গ্রহণ থেকে বঞ্চিত ছিলেন? যা আদৌ বিশ্বাস যোগ্য নয়। পবিত্র কোরআনে আমরা জানতে পেরেছি নবী মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া (আ.) যখন লালন-পালনের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং এই শিশুকে দুধ পান করানোর জন্য ধাত্রীর আহবান করলেন অতঃপর অসংখ্য ধাত্রীর আগমণ ঘটল কিন্তু কেউ শিশু মূসাকে দুগ্ধ পান করাতে সক্ষম হল না। তখন সেখানে উপস্থিত নবী মূসা (আ.)-এর আপন ভগ্নী বললেন, "আমি আপনাদের এমন এক ধাত্রীর সন্ধান দিতে পারি, হয়তো এই শিশু তাঁর দুগ্ধ পান করবে"। আর বাস্তবেও তাই ঘটল, অর্থাৎ আল্লাহ তাঁকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে নিলেন এবং মায়ের দুগ্ধই পান করালেন। উক্ত ঘটনায় ইহাই প্রমানিত হয় যে, আল্লাহর মনোনীত নবী-রাসূলগণ আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত যখন যা ইচ্ছা খাদ্য কিংবা পানীয় গ্রহণ করেন না।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের প্রিয় নবী (সা.) সম্পর্কে কিছু সংখ্যক মুসলমান নামধারী উম্মত এমন সব প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন, যা শুনে অন্য ধর্মের অনুসারীরাও লজ্জাবোধ করেন। যেমন রাসূল (সা.)-কে সদা সর্বদা

---

[১০] আল গাদীর, খণ্ড-৭, পৃ-২৫৮; আল মানাকিব, খণ্ড-১, পৃ-৩৭।

অভাবী, ক্ষুধার্ত ও অসহায় হিসেবে উপস্থাপন, তালিওয়ালা জামা পরিধারণ, রাসূল (সা.)-এর সিনাছাক করে ময়লা দূরিকরণ, রাসূল (সা.)-কে নিরক্ষর নির্ধারণ ও চল্লিশ বছর পর নবী নির্ধারণ সহ বেশ কিছু অসঙ্গতিপূর্ণ কিচ্ছা-কাহিনী আমাদের সমজে প্রচলিত আছে। অথচ পবিত্র কোরআনে বেশকিছু সংখ্যক নবীর নাম ও বর্ণনা রয়েছে, যাঁদের কারো কখনো সিনাছাক করতে হয়নি এবং কেহ নিরক্ষর ছিলেন এমন প্রমাণও নেই। তাই প্রিয় নবী (সা.)-এর উম্মত হিসাবে প্রত্যেক মুসলমানের অন্তত নূন্যতম আকিদা এই হওয়া উচিৎ ছিল যে, আমাদের সমাজে যে সকল বক্তব্য রাসূল (সা.)-এর মান-মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করে এবং ভিন্ন ধর্মের লোকেদের কাছে রাসূল (সা.)-এর শাণ ও মানকে প্রশ্নের সন্মুখিন করে তোলে, অন্তত সে সকল প্রচার-প্রচারণা থেকে বিরত থাকা।

উদহরণ স্বরুপ বলা যেতে পারে যে, ইসলামের ইতিহাসের প্রথম তিন খলিফার সন্মানিত পিতাগণ, কে কোন অবস্থানে ছিলেন বা তাঁরা প্রকাশ্যে কলেমা পড়ে ইসলামের ছায়াতলে এসেছিলেন কি না এবিষয়ে ইতিহাসে তেমন কোন আলোচনা পরিলক্ষিত হয় না। অথচ চতুর্থ খলিফার সম্মানিত পিতা সম্পর্কে যারা মর্যাদাহানীকর বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন তারা কি নিশ্চিত বলতে পারেন যে, দ্বীন ইসলাম এতে কত টুকু উপকৃত হয়েছে?

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মাদ (সা.)-এর ৮ বছর বয়স থেকে শুরু করে তাঁর ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪২ বছরের এক অকৃত্রিম অভিভাবক ছিলেন হযরত আবু তালিব। তিনি যে কেবলমাত্র নবী (সা.)-এর অভিভাবক ছিলেন এমন নয়, তিনি ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা, কল্যানের অগ্রদূত, মজলুমের বন্ধু ও জালেমের শত্রু। নবী (সা.)-এর বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমেও তা প্রকাশ পেয়েছে।

হযরত আবু তালিব সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে ক্ষুদ্র একজন লেখক হিসেবে যে বিষয়টি বারবার আমার অনুভূতিতে নাড়া দিয়েছে তা পাঠক সমীপে প্রকাশ করছি।

পতঙ্গ যখন আলোর সন্ধান পায় . . .
তখন সে আর বাতি থেকে সরতে না চায়
বাতীর অগ্নিতাপে কত পতঙ্গ পুড়ে ছাই হয়ে যায়
তবুও তারা আলো থেকে সরতে না চায়।

তদরূপ হযরত আবু তালিবও সারা জীবন "নূরে মোহাম্মদ"-কে আগলে ছিলেন এবং আমাদের জন্য সেই শিক্ষাই রেখে গেছেন। যেমন, কোরাইশ কাফেরেরা যখন নবী (সা.)-কে তাদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য হযরত আবু তালিবের ওপর চাপ বৃদ্ধি করলো, জীবনের সেই কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে অনড় পাহাড়ের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং আপন সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন যে, মোহাম্মদকে দেয়াতো দূরের কথা যারা তাঁর ক্ষতির চিন্তা করবে তাদেরই অস্তিত্ব তিনি মুছে দেয়ার সংকল্প করেছিলেন। হযরত আবু তালিব যে একজন প্রসিদ্ধ কবি-সাহিত্যক ছিলেন তা সমগ্র আরবে জনশ্রুত ছিল। আবু তালিব কোরাইশ কাফেরদের বিভিন্ন অপকর্মের বিরুদ্ধে নানা সময়ে যে সকল কবিতা, কাসীদা কিংবা বক্তব্য দিয়ে গেছেন তাতেও তাঁর ন্যায়পরায়নাতা ও একত্ববাদের ছাপ রয়েছে সুস্পষ্ট। এর কিছু অংশ সুহৃদ পাঠকের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করছি।

আল্লাহর কসম!
যতক্ষণ আমি জীবিত আছি, কেউ তোমায় কষ্ট দিতে পারবে না,
শান্তচিত্তে দাও তুমি, আপন রবের ঘোষণা।
প্রকাশ করে দাও তুমি, দাওয়াত তোমার সত্য . . .
পূর্ণাঙ্গ নসীয়তকারী তুমি, রবের তুমি বিশ্বস্ত।
দুনিয়ায় আর নাই কোন দ্বীন, তোমার দ্বীনের মত
মোহম্মদ তুমি গর্ব মোদের, তুমি সর্বউন্নত।[১১]

হযরত আবু তালিব আমাদের নবী (সা.)-এর নূরানী চেহারার উসীলা করে যে কবিতাটি পাঠ করেছিলেন তা নিম্নরুপ :

সেই পবিত্র মহান সত্তার, প্রিয় মুখমন্ডলের উসীলায় . . .
তীব্র উষ্ণ মরু অনাবৃষ্টি দিবসেও, পানি দ্বারা স্নাত সিক্ত হয়ে যায়।
মোহাম্মদ যে, খোদার কৃপা বনি হাশেমের গর্ব . . .
অসহায় অনাথ বিধবার সহায় এ গোত্র, জানে আরব সর্ব
আমেনা তনয় নবী মোহাম্মদ, খোদার সেরা দান
মান-মর্যাদায় সর্বগুনী সে, আমাদেরই সন্তান।

---

[১১] শারহে নাহজুল বালাঘা, খণ্ড-৩, পৃ-৩০৬; আল-কাশ্শাফ, খণ্ড-১, পৃ-৪৪৮, খণ্ড-২, পৃ-১০; তাজকিরাতুল খাওয়াস, পৃ-৯; আল-হালবিয়্যাহ্, খণ্ড-১, পৃ-৩২২; এসাবাহ্, খণ্ড-৪, পৃ-১১৬, আল-গাদীর, খণ্ড-৭, পৃ-৩৩৪।

নবী (সা.)-এর প্রতি হযরত আবু তালিবের অকুণ্ঠ ভালবাসার প্রতিফলন তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। অনুরূপ ভালবাসা কেবলমাত্র ঈমানী শক্তির মত আস্থা-বিশ্বাসের মাধ্যমেই সব ধরনের দু:খ-কষ্ট-যন্ত্রণাকে বিলিন করে দিয়ে মানুষকে দৃঢ়-স্থীর-অবিচল থেকে তাঁর পবিত্র কাঙ্খিত লক্ষে পৌঁছানের জন্য মৃত্যুরও মুখোমুখি করে দেয়। আর ঈমানী শক্তির বলে বলিয়ান সৈনিকেরা শতকরা একশত ভাগ বিজয়ী হবেনই। যে সৈনিক মনে করেন, আকীদা-বিশ্বাস ও আদর্শের পথে নিহত হওয়া ও হত্যা করা হচ্ছে পরম সৌভাগ্যের, তখন তার কাঙ্খিত সাফল্য অর্জিত হবেই। তার অন্ত:করণ সত্যের প্রতি ভালবাসার অলোকবর্তিকা দ্বারা অবশ্যই আলোকিত হবে। তার যাবতীয় কর্মকান্ড যুদ্ধ-সন্ধি কিংবা নীরবতা অবশ্যই ঈমানের ভিত্তিতেই নিশ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের চিন্তা-ভাবনার উৎপত্তি হয় তার বিবেক-বুদ্ধি ও আত্মা থেকেই। মানুষ যেমন তার ঔরসজাত সন্তানকে ভালবাসে ঠিক তেমনি সে তার চিন্তা-ভাবনা ও চেতনার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করে। নিজ আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি মানুষের এই ভালবাসা আপন সন্তানের প্রতি ভালবাসার চাইতেও অধিক। যে কারণে মানুষ আপন বিশ্বাস সংরক্ষণে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকেও এগিয়ে যায়। আপন আকিদা-বিশ্বাসের বেদীমূলে মানুষ তার সকল কিছু উৎসর্গ করে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনা। অথচ সে তার সন্তান-সন্ততি কিংবা আপনজনদের রক্ষায় ততটা ত্যাগ স্বীকারে আগ্রহি হয় না।

ধন সম্পদ অর্থ বিত্ত ও পদ মর্যদার প্রতি মানুষের টান কিংবা আগ্রহ ঐ পর্যন্ত যে পর্যন্ত না মৃত্যু তার জন্য নিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ঐ মানুষই আবার যখন আকীদা-বিশ্বাসের মুখোমুখি হয় তখন সে বেঁচে থাকার চেয়ে সম্মানজনক মৃত্যুকেই অগ্রাধিকার প্রদান করে। এমন শত শত প্রমাণও আমাদের সম্মূখে বিদ্যমান রয়েছে। যারা আপন আকীদা-বিশ্বাসের মাঝে মহান সৃষ্টিকর্তার সত্য দ্বীনের আলোকিত পরশ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন তারা বুঝে গেছেন, "জীবন মানে জেহাদ আর জেহাদ মানে মুজাহিদ"।

হযরত আবু তালিব এমনই এক মুজাহিদ ছিলেন, যিনি নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে খোদায়ী নূরের আলো প্রজ্জ্বলিত রাখার নিমিত্তে নূরে মোহাম্মদকে হেফাজত ও সর্বসহযোগিতা প্রদান করে গেছেন। যে কারণে মক্কার গোত্রপতিগণ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, অস্ত্রধারণ ও তাঁকে বয়কট করেও নবী (সা.) থেকে পৃথক করতে সক্ষম হয়নি। যার মূলে ছিল নবী (সা.) ও তাঁর দ্বীনের প্রতি আবু তালিবের অগাধ বিশ্বাস, ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ। আর নবী (সা.) চাচাজানের এ

অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করে গেছেন অকুণ্ঠ ভাবে। যেরূপ আদর-যত্নে তিনি চাচার ঘরে লালিত-পলিত হয়েছিলেন, অনুরূপ আদরে তিনিও হযরত আলীকে লালন-পালন করেছিলেন আপন গৃহে। তবে হযরত আলীর লালন-পালনে নবী (সা.)-এর সেই উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়নি যে, তিনি শুধু চাচার ঋণ শোধ করেছেন। প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, নবী (সা.) হযরত আলীকে নবুয়্যতের নিঃর্যাসে প্রস্তুত করেছেন এবং পরবর্তিতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মত উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন।

নবী (সা.)-এর জন্য হযরত আবু তালিবের সর্বস্ব ত্যাগের যথপোযুক্ত কারণও রয়েছে। বার বছর বয়সী আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-কে নিয়ে তিনি যে ব্যবসায়িক সফরে সিরিয়া গিয়েছিলেন, তখন তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন অসংখ্য মোজেযা। শেবে আবু তালিবে আশ্রয় থাকাকালীন সময়গুলোতেও আবু তালিব প্রত্যক্ষ করেছেন আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর অলৌকিক ক্ষমতাসমূহ। এমন সব খোদায়ী মদদ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পরেও কি আবু তালিব নবী (সা.)-এর দ্বীন গ্রহনে অনীহা প্রকাশ করবেন? তাহলে যারা বিবেচনা ও যাচাই-বাছাই না করে এ মহান ব্যক্তির ঈমান না আনা সম্পর্কে বক্তব্য দিচ্ছেন, তারা কি নিশ্চিত মিথ্যা প্রচার করছেন না?

হযরত আবু তালিব রচিত কবিতা ও কাসীদাসমূহে যে বিষয়গুলো সুস্পষ্ট, তা হচ্ছে নবী (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা, নবী (সা.)-এর হেফাজতের দৃঢ়তা ও নবী (সা.)-এর দাওয়াতী মিশনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস। হযরত আবু তালিব রচিত কাব্য সমগ্রের সংগ্রাহক আবু হাফ্ফান আবদী তার কাসিদায়ে ইলমিয়ায় ১২১টি পংক্তিতে আবু তালিবের কবিতা সংগ্রহ করেছেন। দীওয়ানই আবু তালিব নামক বইতেও হযরত আবু তালিব রচিত কবিতা ও কাসীদা রয়েছে।[১২]

আবু তালিব কোরাইশদের উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য ও কবিতা পাঠ করেছিলেন তা নিম্নে প্রকাশ করা হলো :

"তোমাদের কি জানা নেই যে, আমরা মোহাম্মদকে মূসা ইবনে ইমরান ও ঈসা ইবনে মরিয়মের মত রাসূল হিসেবে পেয়েছি। তাঁর নবুয়্যত সংক্রান্ত বিবরণ পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে।"

পাঠকের সুবিধার্থে যে বিষয়টি একান্তই উল্লেখ্য তা হচ্ছে হযরত আবু তালিব রচিত মূল কাসীদা ও কবিতাসমূহ আরবি ভাষায় সংগৃহীত। পরবর্তী সময়ে

[১২] চিরভাস্বর মহানবী (সা.), খণ্ড-১, পৃ-৩৩২; মাজমাউল বায়ান, খণ্ড-৭, পৃ-৩৬।

যদিও তা বাংলায় অনুবাদ হয়েছে তদুপরি তাতে কাব্যিক ছন্দের অমিল রয়েছে তাই আমরা মূল বিষয়টি অবিকল রেখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কবিতার ছন্দ মিল করেছি মাত্র।

শোন যত কোরাইশ শ্রেষ্ঠ, শোন আরবগণ . . . . .
খোদার শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ, আরতো কেহ নন।
যেমন ছিলেন মূসা ও ঈসা, খোদার কৃপায় নবী . . . . .
মোদের পরে আসছেন তিনি, বল্লেন তাঁরা সবই।
তাওরাত আর ইঞ্জিলে আছে, মোহাম্মদের কথা . . . . .
কিতাব খুললে দেখতে পাবে তাঁর সত্যবাদীতা।

যখন কাফেরেরা হযরত আবু তালিবের নিকট এসে, আমর বিন ওয়ালিদ নামের এক সুশ্রী যুবককে পুত্র হিসেবে গ্রহণ পূর্বক মোহাম্মদ (সা.)-কে তাদের হাতে সোপর্দ করার প্রস্তাব দেয় এবং নবী (সা.)-কে হত্যার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। তখন আবু তালিব মুহূর্তের মধ্যেই ইস্পাত কঠিন ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং কাফেরদের প্রস্তাবের জবাবে বলেন "আল্লাহর কসম তোমাদের প্রস্তাবটি অত্যন্ত খারাপ ও অমার্জনীয়। আমি তোমাদের সন্তানকে লালন পালন করবো, আর তোমরা আমার সন্তানকে হত্যা করবে? কত জঘন্য তোমাদের মন বাসনা! মোহাম্মদকে সোপর্দ করা তো দূরের কথা তার সামান্য ক্ষতির চিন্তাও তোমরা করোনা। আল্লাহর কসম আমি বেঁচে থাকতে কখনো তা হতে দেবো না।

আবু তালিবের এমন ভূমিকা দেখে মুতাম বিন আদী নামের এক কাফের সরদার তাঁকে বলল "হে আবু তালিব! জাতি তোমাকে মোহাম্মদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য উত্তম পন্থা বলে দিয়েছে। আমার ধারণা প্রস্তাবটি তোমার মেনে নেয়া উচিত।" প্রতিউত্তরে হযরত আবু তালিব বলেন, "আল্লাহর কসম! এই জাতি হলো অন্যায়কারী এবং তুমি হচ্ছো তাদের সাহায্যকারী শয়তান, আর মনে রেখ, আবু তালিব কখনোই শয়তানের সাহায্যকারী ছিল না এবং হবেও না।"

অতঃপর তিনি যে কবিতা পাঠ করেন, তা নিম্নরূপ :

শোন হে আরব বাসী . . . . .
কোরাইশের মধ্যে যদি কোন গৌরব থাকে,
তা হচেছ আব্দে মানাফ . . . . .
আব্দে মানাফে যদি কোন গৌরব থাকে,
তা হচ্ছে বনী হাশেম . . . . .

আর বনী হাশেমের শ্রেষ্ঠ গৌরব হচ্ছে
মোহাম্মদে মোস্তফা, আহমাদে মুজতবা . . . . . .
কোরাইশ কাফেরেরা আমাদের প্রতি
আক্রমণ চালিয়েছে সকল প্রকার . . . . .
কিন্তু তারা সফল হতে পারেনি, কোন প্রকার।
তাদের চিন্তা ভাবনায় আছে ভুল, আজো তারা বুঝতে পারেনি . . . . .
আর আমরা কখনো তাদের জুলুম অত্যাচার সহ্য করিনি।
যখনই কেহ অন্যায় ভাবে করেছে অহংকার . . . . .
তখনই তাদের শায়েস্তা করেছি, গর্ব করেছি চুরমার।
মর্যাদা দেই আমরা খোদার, সকল নিদর্শনে . . . . .
খাদেম মোরা খোদার কাবার, ভালবাসি নবীগণে।[১৩]

সূধী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে শুধু এটাই বলবো হযরত আবু তালিবের কবিতা কিংবা কাসীদায় মহান খোদার একত্ববাদ তথা ঈমানের ছোঁয়া আছে কি না তা সকলের বিবেচনায় আনা প্রয়োজন নয় কি?

[১৩] তাবারী, খণ্ড-২, পৃ-৬৭; সীরাতে হালবিয়্যাহ, খণ্ড-১, পৃ-৩২৩; আল-গাদীর, খণ্ড-৭, পৃ-৩৬০।

ইসলাম প্রচারের পূর্বে মোহাম্মদ (সা.)

মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁর রেসালাতের মিশনকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছেন। যেমন জন্মের তৃতীয় দিনে নবী ঈসা (আ.)-এর মুখে ঘোষণা করালেন :

قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ آتَانِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

"আমি আল্লাহর দাস, আমাকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে। আমাকে নবী বানানো হয়েছে।"[১৪]

আবার যিনি নবী-রাসূলগণের সর্দার তাঁকে রেসালাতের ঘোষণা প্রদান করতে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৪০ বছর। যদি আমরা এ বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করি তবে বুঝতে পারব যাঁর যাঁর আগমণকালীন সময় পরিবেশ পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটই এর মূল কারণ। নবী ঈসা (আ.)-এর সময়ে তাঁর শিশু অবস্থায় তাওহীদের ঘোষণার প্রেক্ষাপট ছিল, আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত পবিত্র আত্মা মরিয়মের চরিত্র মাধুরির ওপর তৎকালীন বকধার্মিক ও ধর্মব্যবসায়ীদের কালিমা লেপনের বিরুদ্ধে আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) কর্তৃক সাবধানবাণীর প্রকাশ্য ঘোষণা প্রদান ছিল তার অত্যাবশ্যকীয় কারণ।

আর আমাদের প্রিয় নবী আগমনের পূর্বে সমগ্র আরব ছিল বর্বর মূর্খ ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজ। সেই সমাজের মাঝে সৃষ্টিকর্তা তাঁর নবী (সা.)-এর চরিত্র মাধুরীর আলোকিত পরশ ছড়াতে ছড়াতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তা ছিল ৪০ বছর। আর এ সময়ের মধ্যেই অসংখ্য লোক যখন খোদায়ী বিধানের আলোর পরশে সিক্ত হতে শুরু করলেন এবং নবী (সা.)-এর চারিত্রিক গুণাবলীর সৌরভ প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় সমগ্র আরবে ছড়াতে লাগল। তখন আরববাসীগণ তাঁর নাম রেখেছিলেন 'আল-আমিন'। সৃষ্টিকর্তা প্রথমে তাঁর নবীকে দিয়ে প্রেক্ষাপট তৈরি করলেন। আর দলে দলে মানুষ যখন খোদায়ী আলোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে লাগল তখনই সৃষ্টিকর্তা তাঁর নবীকে প্রকাশ্যে নবুয়্যতের ঘোষণা প্রদানের তাগিদ করেন এবং নবী (সা.) তাই

---

[১৪] সূরা মরিয়ম, আয়াত-৩০।

করলেন। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তিনি ৪০ বছর পর নবী হয়েছেন। কারণ এটাও পবিত্র কোরআনে প্রকাশিত আছে, নবী ঈসা (আ.) বলছেন :

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

"আর যখন মারইয়াম পুত্র ঈসা বলেছিল, 'হে বনী ইসরাঈল, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল। আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম আহমেদ'। অতঃপর তিনি যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে আগমণ করলেন, তখন তারা বলল, 'এটাতো স্পষ্ট যাদু'।[১৫]

"আমার পর যে রাসূল আগমণ করবেন তিনি হচ্ছেন আহমদ" অর্থাৎ নবী ঈসা (আ.) যখন আমাদের নবী (সা.)-এর আগমনের কথা বলছেন তখনও তিনি দুনিয়াতে আসেননি। এখানেই সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, নবুয়্যত প্রাপ্তি ৪০ বছর পরে নয়। পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেই মোহম্মদ (সা.) নবী-রাসূল।

আবার পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ পাক একথাও বলছেন :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ

"মোহাম্মদ আর কিছুই নয় তিনি শুধুই আল্লাহর রাসূল"[১৬]

অর্থাৎ যখনই 'মোহাম্মদ' (সা.)-এর সৃষ্টি তখন থেকেই 'রাসূল'। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম উম্মার এক বিরাট অংশ তাদের নবী সম্পর্কে এমন ভুল আকিদা পোষণ করেন যে, "তিনি ৪০ বছর পর নবুয়্যত লাভ করেছেন"। যদি বিষয়টিকে সেভাবে না নিয়ে আল্লাহ পাকের পরিকল্পনা অনুযায়ী মানা হোতো যে, "নবী (সা.) তাঁর নবুয়তী মিশনের পরিপূর্ণ কার্যক্রম ৪০ বছর বয়সে দিগন্ত জুড়ে প্রসারিত করেছেন"। আর তাহলে হয়তো মুসলমানদের মাঝে রাসূল (সা.)-এর প্রতি মার্যাদাহানীকর ঐ ভুল আকিদাটি সম্প্রসারিত হোতো না।

---

[১৫] সূরা আস-সাফ, আয়াত-৬।
[১৬] সূরা আল ইমরান, আয়াত-১৪৪।

নবী মোহাম্মদ (সা.)-এর বিবাহ পড়ান হযরত আবু তালিব

চাচা হযরত আবু তালিবের সাথে নবী (সা.)-এর ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে সাফল্যের কথা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র আরবে। তাছাড়া মোহাম্মদ (সা.)-এর সততা সদাচরণ ও সত্যবাদিতার সুনাম পূর্ব থেকেই আরববাসীদের আকৃষ্ট করে রেখেছে। আর এমন সব সুসংবাদ তৎকালিন আরবের বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী আসাদ গোত্রের খোয়াইলিদের কন্যা বিবি খাদিজার কানেও পৌঁছায়। তিনি তাঁর কর্মচারী মাইসারার মাধ্যমে নবী মোহাম্মদের কছে প্রস্তাব পাঠান তাঁর ব্যবসার দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্যে। নবী (সা.) তৎক্ষনাৎ খবরটি চাচা হযরত আবু তালিবকে অবহিত করেন এবং তাঁর অনুমতির অপেক্ষায় ছিলেন।

হযরত আবু তালিব পূর্ব থেকেই বিবি খাদিজার উদারতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই তিনি নবী (সা.)-কে বিবি খাদিজার ব্যবসার ভার নেয়ার অনুমতি প্রদান করেন। নবী (সা.) বিবি খাদিজার ব্যবসার দায়িত্ব নেয়ার পর দেশ-বিদেশের সফর শেষে মক্কায় ফিরে আসলে বিবি খাদিজা মাইসারার কাছ থেকে জানতে পারেন, মোহাম্মদ (সা.)-এর অক্লান্ত পরিশ্রম, সততা, ব্যবসায়িক উন্নতি ও নানা অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে। যতই দিন যাচ্ছিল বিবি খাদিজা নবী (সা.)-এর প্রতি ততই আকৃষ্ট হতে লাগলেন।

এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, বিবি খাদিজা ছিলেন তৎকালীন আরবের কোরাইশ বংশীয় পূর্বপুরুষ 'কুশাই'-এর পুত্র আব্দুল উজ্জা তদীয় পুত্র, আসাদ, তাঁর পুত্র খোয়াইলিদের কন্যা। তাঁর জন্ম যেরূপ অভিজাত বংশে আবার তাঁর চালচলন, স্বভাব, আচরণ ও কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তা, তীক্ষ্ম মেধা এবং উদার মনোভাবেও ছিল আভিজাত্যের ছাপ।

সমগ্র আরবজুড়ে পিতার ব্যবসার দেখাশোনা ও কর্মপরিকল্পনাকারিণী তিনি নিজেই ছিলেন। মূলত বিবি খাদিজা সেই পুরুষের অপেক্ষায় ছিলেন যার মধ্যে থাকতে হবে বংশীয় মর্যাদা, আদর্শবাদীতা, নৈতিকতা, উদারতা ও খোদাভীরুতা। আর এই জন্য তাঁকে অনেক বছর অপেক্ষাও করতে হয়েছে। অবশেষে তিনি তা পেয়েছেন।

যখন সমগ্র আরবে মোহাম্মদ (সা.)-এর সুনাম ও যশ ছড়িয়ে পড়েছে, আর বিবি খাদিজা'ও দেখলেন গত ২০/২৫ বছরে অনুরূপ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোনো লোকের নাম আরব জনগণের জানা ছিল না। তখন তিনি বিবেচনায় আনলেন তাঁর স্বামী হওয়ার উপযুক্ততা এই মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লার মধ্যেই রয়েছে।

তিনি স্বউদ্যগে তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ও নিকট আত্মীয় নাফিসা বিন্‌তে মুনিয়াহকে প্রস্তাবসহ নবী (সা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। নবী (সা.) কাবার সন্নিকটে ছিলেন। নাফিসা নবী (সা.)-কে নিজের পরিচয় দিয়ে আলোচনা করার কথা বললে নবী (সা.) আলাপচারিতায় বসলেন। নাফিসা বললেন, "হে মোহাম্মদ আপনি একজন যুবক এবং একা। সামান্য কয়েকজন কিশোর ব্যতীত আপনার চেয়ে কম বয়সের পুরুষেরা বিবাহ সম্পন্ন করেছে। আপনি এখনো বিয়ে করছেন না কেন?" নবী (সা.) বললেন, "বিয়ে করার জন্য আমি যথেষ্ট সমৃদ্ধশিল নই।" নাফিসা বললেন, "যদি আপনার সমৃদ্ধহীনতা সত্ত্বেও কোন সমৃদ্ধশিল সুন্দরী সম্মানিতা ও অভিজাত পরিবারের নারী আপনাকে বিয়ে করতে রাজি থাকেন, তবে কি আপনি তাতে সম্মতি দিবেন?" নবী (সা.) বললেন, "কে হতে পারেন সেই নারী?" নাফিসা বললেন, "তিনি হচ্ছেন খাদিজা বিনতে খোয়াইলিদ"। এখন আপনি সম্মত হলে, বিবাহের সকল ব্যবস্থা আমি করব"। নবী (সা.) বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ! আপনার প্রস্তাব অতি উত্তম। তবে আমাকে একটু সময় দিন। আমি আমার পিতৃব্য চাচার পরামর্শ নিয়ে আপনাকে জানাচ্ছি"।

যেহেতু হযরত আবু তালিব কাবার মোতাওয়াল্লী ছিলেন, সে কারণে তিনি বিবি খাদিজার সাথে পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিলেন। তিনি যখন নবী (সা.)-এর কাছ থেকে এ কথা শুনলেন তখন নাফিসার প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেন। আর মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে বললেন, "হে খোদা এদের সেই মর্যাদা দিয়ো যেন তাঁরা হতে পারে পৃথিবীর আদর্শ দম্পতিদের অন্যতম"।

হযরত আবু তালিব তাঁর বোন সাফিয়াকে আরবের রীতি-রেওয়াজ অনুযায়ী হযরত খাদিজার বাড়িতে পাঠালেন। মোহাম্মদ (সা.) ও তাঁর পরিবারের স্বীকৃতি প্রকাশের জন্যে। ইতিমধ্যে নাফিসাও পটভূমির কাজ সুসম্পন্ন করলেন। হবু শ্বশুরবাড়ি থেকে আগত অতিথিদেরকে বিবি খাদিজা সম্মানের সাথে আপ্যায়ন ও উপহার প্রদান করেন এবং হযরত আবু তালিব ও বর পক্ষের অতিথিদের আগমণের আমন্ত্রণ জানালেন। যথারীতি হযরত আবু তালিব তাঁর ভাই হামজা ও আব্বাস সহ আরো কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে উপহার সমেত বিবি খাদিজার

বাড়িতে আসেন এবং বিবাহের দিন-তারিখ ধার্য্যপূর্বক পানাহার শেষে বিদায় নেন।

আবু তালিব নিজেই ভাতিজার পক্ষ হয়ে বিবাহের সকল প্রস্তুতির দায়িত্ব নেন। যথারীতি নির্ধারিত তারিখে বরকে আরবীয় প্রথানুসারে বনী হাশেমের রেখে যাওয়া মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক রত্নসমূহ দিয়ে সাজানো আলখেল্লা, ছড়ি, কালো পাগড়ি ও আংটি সমেত রাজকীয় সাজে সাজানো অনেকগুলো বলিষ্ঠ ঘোড়ার বহরে হাশেমি যুবকদের কুচকাওয়াজ দল ও কোরাইশ বংশের উর্দ্ধতন নেতৃবৃন্দ ও গোত্র প্রধানগণের সমন্বয়ে বরযাত্রীগণ কন্যার বাড়িতে উপস্থিত হন। আগত অথিতিদের সুস্বাগতম জানিয়ে বরণ করার জন্য বিবি খাদিজা তাঁর এস্টেটের প্রধানকে দিয়ে পূর্ব থেকেই একটি অভ্যর্থনাকারী দল প্রস্তুত রেখেছিলেন। তারা বরযাত্রীদের নিয়ে একটি বিশাল আকৃতির হলরুমে বসালেন। যে ঘরের দেয়াল ও মেঝে ছিল শ্বেতপাথরে বাঁধানো এবং ছাদ ছিল নানা কারুকার্য খচিত, সৌখিন সামিয়ানা দ্বারা আচ্ছাদিত। আর এই বিশেষ আয়োজনে বিবি খাদিজার গৃহের নারী পুরুষদের ছিল বিশেষ পোশাকের ব্যবস্থা। পুরুষদের জন্য নক্ষত্রখচিত আলখেল্লা, রঙিন পাগড়ি এবং কালো রেশমি কাপড়ের কোমর বন্ধন ও মাথার পাগড়িতে শুভ্র পালক। আর নারীরা ছিলেন জমকালো পোশাকে, যাছিল স্বর্ণ তারকা খচিত। তাদের চেহারা ব্যতিত মাথা ও চুল বিশেষ কাপড়ে আবৃত ছিল আর কোমর ও পা পর্যন্ত ছিল মূল্যবান ওড়না ও কাপড়ে আচ্ছাদিত এবং তা ছিল মুক্তা দিয়ে সাজানো। নববধুর কক্ষের সাজসজ্জায় ছিল চমৎকার শৈল্পিক নিপুণতা ও দক্ষতায় পরিপূর্ণ। রেশমী কাপড় ও জরি দিয়ে সাজানো আঙিনা। আর মেঝেতে ছিল শ্বেত রঙের মখমলের গালিচা ও রুপালী পাত্র থেকে সুগন্ধিযুক্ত সৌরভের ধোঁয়া বিচ্ছুরন হচ্ছিল চারদিকে। পানপাত্র আর গোলাপ দানিতে সাজানো ছিল বাহারী রঙের ফুল। বিবি খাদিজা এক অভিজাত সামিয়ানার নিচে উঁচু বেদীতে আসন গ্রহণ করলেন। এ যেন পূর্ণিমার চাঁদ ধরায় নেমে এলো। এখানে একটি বিষয় পাঠকের অবগতি প্রয়োজন। বিবি খাদিজার চাচা আমর বিন আসাদ এই বিবাহে কন্যার অভিভাবক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিবাহ পড়ানোর পূর্বে হযরত আবু তালিব যে খোতবা প্রদান করেন তার নিম্নরূপঃ

আলহামদুলিল্লাহ শুকরিয়া আদায় করি সেই মহান সৃষ্টিকর্তার, যিনি আমাদের প্রতি বর্ষণ করেছেন তাঁর অগণিত দয়া, রহমত ও বরকত। তিনি আমাদেরকে ইব্রাহীমের বংশধর ও ইসমাইলের সন্তানদের অর্ন্তভূক্ত করে পবিত্র কাবা ঘরের খাদেম মনোনীত করেছেন এবং এ মহান ঘরের নিরাপত্তা ও হজ্ব অনুষ্ঠানের সাহায্যকারী হওয়ার সুযোগ আমাদের দান করেছেন। আমার ভাতিজা মোহাম্মদ বিন্ আব্দুল্লাহ সম্পদশালী না হলেও বংশীয় মর্যাদা, জ্ঞান-বুদ্ধি, আখলাক-চরিত্র, আচার-আচরণ ও খোদাভীরুতায় সমগ্র আরবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। আর খাদিজা বিন্‌তে খোয়াইলিদ যিনি বংশীয় ধারায় আরবের অভিজাত বংশে জন্ম নিয়েছেন। তাঁর বিচক্ষণ বুদ্ধিমত্তা ও উদার মহানুভবতায় আরব জনগণ পূর্ব থেকেই উপকৃত হয়ে আসছেন। "হে খোদা! তুমি স্বাক্ষী থেকো আমি মোহাম্মদের সঙ্গে এই মহিয়সী নারীর বিবাহের দোয়া পাঠ করছি এবং পাঁচশত স্বর্ণ মুদ্রা খাদিজার দেনমোহর ধার্য্যপূর্বক এই বিবাহ সম্পন্ন করছি। হে খোদা! তুমি তাদের সংসার জীবনে তোমার প্রশান্তি দান করো। আপনারা উপস্থিত সকলে উভয়ের মঙ্গল কামনায় মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করুন।"

অতঃপর বিবি খাদিজার চাচা আমর বিন্ আসাদ হযরত আবু তালিবের খোতবা শেষে কন্যার পক্ষ থেকে নিজেদের মত প্রকাশ করে তিনি বলেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহর। কিছুক্ষণ পূর্বে বনী হাশেম সর্দার যে খোতবা প্রদান করেছেন আমরা তা সত্য জ্ঞান করি এবং তার স্বাক্ষ্য প্রদান করি। তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব আরবে অস্বীকার করার মতো কেউ নেই। আর এ কারণেই আমরা খাদিজা ও মোহাম্মদের বিবাহের ব্যাপারে আগ্রহী হই। হে খোদা! তুমি তাঁদের এই বন্ধন চির অটুট রেখো।"

অভিভাবক হিসেবে তিনি বিবি খাদিজার হাতকে মোহাম্মদ (সা.) হাতে তুলে দিলেন। হযরত আবু তালিব বরের পক্ষ থেকে মোহরানা প্রদান করেন। উপস্থিত সকলে নবী (সা.)-কে বিবাহের অভিনন্দন ও তাঁদের ভবিষ্যত জীবনের শান্তি কামনায় দোয়া করেন। এই মহোৎসবে সকলেই হযরত আবু তালিবকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। যখন বর-কনে এক ঘরে এলেন তখন নবী (সা.)-এর চেহারা সূর্যের ন্যয় মনে হলো, যেন চন্দ্র সূর্যের অবস্থান একই সমান্তরালে।

যথারীতি মেহমানদের রাজকীয় খাওয়া পরিবেশন করা হয়। রান্না সম্পর্কীয় যে কোনো শিল্প থাকতে পারে তা অনেকেই সেদিন জানতে পেরেছেন। ভোজন

শেষে পদ্ম ফুলের নির্যাস দ্বারা মেহমানদের তৃষ্ণা নিবারণ করা হয়। অতঃপর ঘোষণা হল নববধূ প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত। দামি রেশমি বস্ত্রে সজ্জিত একটি মাদি ঘোড়া, তার পিঠে সাদা তাবু সাজানো। কনে ও তার সখি সেই ঘোড়ায় আরোহন করার জন্য অপেক্ষমাণ। সাথে এক কাফেলা উটের সারি। যাতে রয়েছে দাস দাসীসহ কন্যার যাবতীয় ব্যবহারিক সরঞ্জামাদি। আবার অন্য দিকে আছে আগত বরযাত্রীদের সাজানো উটের সারি। একটি মশাল মিছিলের মতো কাফেলা যখন হযরত আবু তালিবের বাড়ি এসে পৌছালো, তখন হযরত আবু তালিবের স্ত্রী কন্যা ও আত্মীয়গণ আরবীয় রীতি অনুযায়ী নববধূকে বরণ করে নেন।

মোহাম্মদ (সা.) ও বিবি খাদিজার বিবাহ হাশেমি ও খোয়াইলিদ গোত্রের মাঝে খুশির জোয়ার এনে দিল। বিবাহের তিন দিন পর হযরত আবু তালিব ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সমগ্র মক্কা নগরবাসী উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন। আর স্বয়ং নবী (সা.) মেহমানদের স্বাগত জানান ও খোঁজ-খবর নেন। এ অনুষ্ঠান তিন দিন যাবৎ স্থায়ী হয়।

হযরত আবু তালিবের এই আতিথেয়তা আজও ইসলামে "ওয়ালিমা" হিসেবে প্রচলিত আছে। সেই আয়োজনটি ছিল অবিস্মরণীয়। মক্কার সর্বোচ্চ মহল থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যায়ের যাযাবর ভিখারী পর্যন্ত কেউই এ বিয়েতে বাদ পড়েনি। নবী (সা.)-এর ওয়ালিমার ভোজ অনুষ্ঠানে উচুঁ-নিচুর ব্যবধান ছিল না। ছিল প্রাণবন্ত আপ্যায়নের ব্যবস্থা। আবার ভোজ শেষে উপহার। নিঃস্ব অসহায়দের পোশাক পরিচ্ছেদের ব্যবস্থা। নবী (সা.)-এর বিবাহ যেন সমগ্র মক্কায় এক অনাবিল শান্তির পরশ ছিল।

পঁচিশ বছর বয়সে নবী (সা.) চল্লিশ বছরের বিবি খাদিজাকে জীবনসঙ্গিণী করেন। দাম্পত্য জীবনে নবী (সা.) অত্যন্ত সুখী ছিলেন। ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত নবী (সা.) এক মুহূর্তের জন্যও বিবি খাদিজাকে যেমন ভুলে থাকতে পারেননি, অনুরূপ বিবি খাদিজাও বলেছেন, "অনন্ত শুকরিয়া আদায় করছি সেই মহান প্রভুর যিনি আমার প্রতি দান করেছেন মোহাম্মদকে স্বামী হিসেবে। আর মোহাম্মদকে না পেলে আমি তো দয়াময়ের সকল রহমত থেকেই বঞ্চিত হতাম।"[১৭]

---

[১৭] আল্ মোস্তফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:৯১, ৯২; সীরাতুন নবীয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ:১০৬; আল গাদীর, খণ্ড-৭, পৃ:২৭৪; উম্মুল মুমেনিন খাদিজা আত তাহিরা (রা:), পৃ: ৩০-৩৫; আস্ সিরাতুন নবী, খণ্ড-১, পৃ:১০৬; আল হুজ্জাত, পৃ: ৩৬।

এখানে সম্মানিত পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণে আমি শুধু এটুকু স্মরণ করাতে চাই, পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কোনো নবী-রাসূলের বিবাহ কোনো সাধারণ কিংবা ঈমানহীন ব্যক্তির পক্ষে পড়ানো সম্ভব হয়েছিল কি? অথবা এমন কোন সংবাদ কিংবা প্রমাণ কেউ উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে কি? উত্তর একটাই 'না'। তাহলে যারা হযরত আবু তালিবের ঈমান সম্পর্কে কথা বলেন, তারা দয়া করে কোরআন, হাদীস ও ইতিহাসের আলোকে বিষয়টি যাচাই করলেই প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, তারা কতটুকু সত্য প্রকাশ করছেন।

আধ্যাত্মিক সাধনায় মোহাম্মদ (সা.)

বিবি খাদিজাকে বিবাহের পর নবী (সা.)-এর আর্থিক সঙ্কট মোচন হয়েছিল। তাই সাংসারিক প্রতিকূলতা সামাল দিতে বিবি খাদিজা-ই যথেষ্ট ছিলেন। যে কারণে নবী (সা.) ঐশী চিন্তায় নিমগ্ন হওয়ার অধিক সময় ও সুযোগ পেলেন। আর শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন চিন্তাশীল। মুসলমানদের একটা বিরাট অংশ মনে করেন যে, নবী (সা.) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকেই এক অজানা রহস্যলোকের সাথে তাঁর আত্মার সংযোগ ছিল। আধ্যাত্মিক জগতের অনেক দৃশ্য তাঁর মনসপটে ভেসে উঠতে লাগল। মনে হতো কে যেন তাঁর কর্ণকুহরে কি যেন বলে গেল। কে যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, কে যেন চোখের সামনে এসে আবার মূহূর্তেই হারিয়ে গেল। কখনও কখনও তিনি স্পষ্ট শুনতে পেতেন, কে যেন ডেকে বলছে, "মোহাম্মদ আপনি আল্লাহর রাসূল"। আর স্বপ্নে দেখতে পেতেন, স্বর্গীয় শোভামণ্ডিত অলৌকিক বিষয়াবলি। এভাবে অন্তরের প্রদীপ্ত চেতনায় তিনি অধীর হতে লাগলেন এবং এভাবেই তাঁর ১৫ বছর অতিবাহিত হলো। এক অজানা শঙ্কা-ভীতি, অস্বস্তি ও উদ্বেগ এবং একই সাথে অজানাকে জানার দূর্জয় কৌতূহল ও জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁকে অভিভূত করে তুললো। সংসারের কর্মকোলাহল যেন তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনাকে ব্যর্থ না করে। সমাজ জীবনের পঙ্কিলতা যেন ঐ পবিত্র জ্যোতির গতিস্রোত রুদ্ধ না করে।

আর বাস্তবতা হচ্ছে সহধর্মিণী খাদিজা প্রিয় স্বামীর সকল কর্মকাণ্ডে সার্বিক সহযোগিতা করতে লাগলেন। তিনি নবী (সা.)-কে ২/৩ দিনের খাদ্য পানীয় প্রস্তুত করে দিতেন। নবী (সা.) তা নিয়ে হেরা গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। খাদ্য পানীয় শেষ হয়ে গেলে নবী (সা.) গৃহে ফিরে আসতেন, আবার যেতেন। কখনও ফিরে আসতে দেরি হলে বিবি খাদিজা নিজেই খাদ্য পানীয় নিয়ে হাজির হতেন অথবা হযরত আলীকে দিয়ে হেরা গুহায় পাঠিয়ে দিতেন। বিবি খাদিজা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর স্বামীর মধ্যে এক অন্তঃবিপ্লব চলছে এবং তা ক্রমশ একটি পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। নিশ্চই তিনি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ, যা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন।

নবী (সা.)-এর ধ্যানমগ্ন দিনগুলোতে তিনি নিবিড় আত্মতৃপ্তি উপলব্ধি করছিলেন। আর তা সম্ভব হয়েছিল বিবি খাদিজা এবং কিশোর আলীর স্বক্রিয় সহযোগিতার দরুন। তখন রমজান মাস, এক গভীর রাতে নবী (সা.) ধ্যানমগ্ন

ছিলেন। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন কেউ যেন তাঁর নাম ধরে ডাকছেন, "হে মোহাম্মদ", তিনি চোখ খুললেন, দেখলেন এক জ্যোর্তিময় ফেরেস্তা তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাঁর জ্যোতিতে গুহা আলোকিত হলো। তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর বাণী বাহক ফেরেস্তা, জিব্রাইল . . . হে মোহাম্মদ,

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ

পাঠ করুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন।"[১৮]

মহা সত্যের প্রথম উপলব্ধিতে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। নবী (সা.) ত্বরা করে বিবি খাদিজার কাছে ছুটে গেলেন। বিবি খাদিজা তাঁর অস্থিরতা দেখে বুঝতে পেরে বললেন, "আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ কখনও আপনাকে নিরাশ করবেন না, কারণ আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেন না। আপনি অন্যের জন্য নিজে কষ্টের বোঝা বহন করেন। মানুষের দুর্যোগ দূর্বিপাকে সাহায্য সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করেন। দুঃস্থ নিঃস্বদের জন্য উপার্জনের ব্যবস্থা করেন এবং ঘোর বিপদেও সত্য থেকে বিচ্যুত হন না।" এভাবে স্বামীকে সান্তনা দিলেন।

অতঃপর তাঁর দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নওফেলের স্মরণাপন্ন হলেন। যিনি ছিলেন ইঞ্জিল কিতাবের অনুসারী একজন জ্ঞানতাপস। বিবি খাদিজা নবী (সা.)-এর বিষয়ে তাকে অবহিত করলেন। ওরাকা কিতাব মিলিয়ে খুশিতে উচ্চারণ করলেন "কুদ্দুসুন কুদ্দুসুন 'এটা সেই নিদর্শন যা মূসা ও ঈসার প্রতি প্রেরিত হয়েছিল। তবে মনে রেখো সামনে অনেক বিপদ, সাবধান থেকো"। আবার বললেন, "হায় মোহাম্মদ, তোমার দেশবাসী তোমার ওপর কতই না অত্যাচার করবে। তোমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবে। তুমি আদম সন্তানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি বেঁচে থাকলে তোমাকে সাহায্য করব।" ওরাকার মুখে এমন সব সংবাদ শুনে বিবি খাদিজার অন্তর তৃপ্ত হলো। তাঁর স্বামী মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দাদের অন্যতম।

তিনি ঘরে ফিরে এসে নবী (সা.)-এর হাতে হাত রেখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং আল্লাহর দ্বীন গ্রহণের প্রথম স্বাক্ষ্যদাতার গৌরব অর্জন করেন। আর দ্বিতীয় স্বাক্ষ্যদাতা হলেন কিশোর হযরত আলী। মহান সৃষ্টিকর্তার পবিত্র দ্বীন ইসলাম তাঁর প্রিয় নবী (সা.)-এর পর, যাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও প্রাণপন ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের নিকট পর্যন্ত এসে পৌঁছিয়েছে। তাঁদের সে

[১৮] সূরা আলাক, আয়াত-১।

অবদানকে যদি কেউ ভুলে যায় কিংবা খাটো করে দেখে তবে তা হবে অকৃজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ নতুবা নিরেট মোনাফেকি।

এখানে আরো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করছি, নবী (সা.) প্রকাশ্যে নবুয়্যত ঘোষণা দেয়ার পূর্বে তিনি তাঁর চাঁচা হযরত আব্বাসের নিকট গিয়ে বলেছিলেন যে, "আল্লাহ আমাকে তাঁর হুকুম প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন, সুতরাং এ মর্মে আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আমার বাহুকে শক্তিশালী করুন।" ঐসময় হযরত আব্বাস তাঁর দূর্বলতা প্রকাশ করে বলেছিলেন, "হে বৎস! তুমি আমার ভাই আবু তালিবের নিকট এই বক্তব্য উপস্থাপন করো, তিনি আমাদের সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি তোমাকে সাহায্য কিংবা সঙ্গ কোনোটাতেই পিছপা হবেন না।" অতঃপর উভয়ই হযরত আবু তালিবের সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং হযরত আব্বাস নবী (সা.)-এর বক্তব্য পূনরাবৃত্তি করে নিজের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করলেন। হযরত আবু তালিব সমূদয় বক্তব্য শোনার পর নবী (সা.)-কে বুকে টেনে নিলেন। অতঃপর বললেন, "হে, মুহাম্মদ! যাও নির্ভয়ে ঘোষণা দাও, তোমার রবের পক্ষ হতে যা তোমাকে বলা হয়েছে। কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, অন্তত আমি যতদিন বেঁচে আছি।"[১৯]

সুহৃদ পাঠক/পাঠিকার জ্ঞাতার্থে যে বিষয়টি উল্লেখ্য তা হচ্ছে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবী রাসূল ও বান্দাদের প্রতি যে সংবাদ বা মেসেজ প্রেরিত হয়, তা তিনটি মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন ওহী, ইল্হাম ও স্বপ্ন। আর এ তিনটির দুটিই নবী (সা.)-এর শিশু অবস্থা থেকে বিদ্যমান ছিল। শুধু ওহী এসেছে পরিণত বয়সে। যার প্রমাণস্বরূপ বলা চলে, মাত্র আট বছর বয়সে নবী (সা.) 'হজরে আসওয়াদ' নামক পাথর স্থানান্তর নিয়ে যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, তিনি তার সুষ্ঠু সমাধান দেন। এর মূলে ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে শিশু নবী (সা.)-এর অন্তরে অলৌকিক মেসেজ প্রেরণ। যাকে 'ইল্হাম' বলা হয়। যদি তা না হতো তবে ঐ পাথরকে কেন্দ্র করে প্রচুর প্রাণহানী ও গোত্রীয় দ্বন্দ্ব বিদ্যমান থাকত দীর্ঘকাল।

আমরা মুসলমানেরা শুধু নই দুনিয়ার সকল ধর্মের মানুষ এ বিষয়ে একমত যে, নবী (সা.) শিশু, কিশোর, যুবক কিংবা বৃদ্ধ অবস্থায় জীবনে কোনো কালেই কোন মিথ্যা, অশালীন, ইয়ারকী, ধোঁকা, প্রলাপ কিংবা উত্তেজিত হয়ে কোন অনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। উদাহরণস্বরূপ একটি হাদিস উল্লেখ করছি

[১৯] আল-গাদীর, খণ্ড-৭, পৃ-৩৪৮; শায়খুল আবতাহ, পৃ-২২; আল-আব্বাস, পৃ-১২-২৩।

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনি কখন নবুয়ত লাভ করেছেন? তিনি বললেন, "যখন আদম পানি ও মাটির মাঝে ছিলেন"[২০]। অর্থাৎ আদমের অস্তিত্বের পূর্বেও তিনি নবী ছিলেন।

উল্লিখিত হাদীসে এটাই প্রমাণ করে নবী-রাসূলগণ আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ও নির্ভুল। অর্থাৎ নবী (সা.)-এর বয়স যাই হোক না কেন, তিনি আল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত সর্বাবস্থায়। একজন লেখক হিসেবে আমি তাই মনে করি। ইলহাম, স্বপ্ন কিংবা ওহী এর যেকোনোটি নবী (সা.)-এর কাছে আসা খুবই স্বাভাবিক। যেমনটি বলা চলে আল্লাহ পাক বিবি মরিয়মকে কথা না বলার ও রোজা পালনের বিষয় জানালেন এবং কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর লাভের উপায় হিসেবে নিজ শিশুর প্রতি ঈঙ্গিত প্রদানের কৌশল শিখিয়ে দিলেন এবং বাস্তবেও তাই ঘটেছিল। তিন দিনের শিশু ঈসা তৎকালীন বকধার্মিকদের কুরুচিপূর্ণ হীন মন্তব্যের বিরুদ্ধে কঠিন জবাব দিয়ে জানিয়ে দিলেন তাঁর মাতা বিবি মরিয়ম পৃথিবীর পবিত্রতম মহিলাদের অন্যতম।

قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ آتَانِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً

"তিনি আল্লাহর দাস তাঁকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে এবং তাঁকে নবী মনোনীত করা হয়েছে।"[২১] নবী ঈসা (আ.)-এর এই বক্তব্য প্রদানের বিষয়টি ছিল ইলহাম।

আবার কথিত আছে নবী ইব্রাহিম (আ.)-কে আল্লাহ পাক স্বপ্নের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, "তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে কোরবানি করো"। বহু ত্যাগ তিতীক্ষার পর তিনি যখন আপন সন্তান ইসমাইলকে কোরবানি দেয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন, তখন তাঁর কোরবানি গৃহীত হলো। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরবানি হলো এক দুম্বা। এভাবে নবী ইব্রাহীমের স্বপ্ন পরিণত হলো বাস্তবে।

আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ (সা.)-এর নিকট হযরত জিব্রাইলের আগমণই ছিল ওহী। কারণ তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন না কোনো সংবাদ নিয়েই আগমণ করতেন। উল্লিখিত ঘটনাসমূহের আলোকে এটাই প্রমাণিত যে, আল্লাহর মনোনীত কোন নবী-রাসূলই পূর্বে সাধারণ লোক ছিলেন না এবং ৪০ বছর পর নবী মনোনীত হয়েছেন এমন ও নয়। কারণ আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র ও নির্ভুল এবং তাঁর মনোনীত নবী রাসূল ও ইমামগণ নির্ভুল ও মাসুম সর্বাবস্থায়।

---

[২০] সহীহ তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ-২৮২; তারিখে বাগদাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ-৭০।

[২১] সূরা মরিয়ম, আয়াত-৩০।

‘শেবে আবু তালিব’-এ আশ্রয়

মক্কার কাফের মুশরিকরা শত চেষ্টা করেও যখন মোহাম্মদ (সা.)-কে তাঁর দ্বীনের প্রচার রোধ করতে ব্যর্থ হলো, আবার হাশেমিদের সাথে যুদ্ধের পরিণতি হবে ভয়াবহ এবং হযরত আবু তালিবের নিকট বার বার অভিযোগ করেও যখন কোনো ফল হলো না। তখন তারা এক পরামর্শ সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিল যে, সামাজিকভাবে বনী হাশেমের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। তাঁদের সাথে কেউ উঠা-বসা, কথা-বার্তা ক্রয়-বিক্রয় ও কোনো প্রকার আদান-প্রদান কিংবা লেনদেন করবে না। এ মর্মে কাফেরদের স্বাক্ষরিত একটি শপথ পত্র তাঁরা কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দিল। তদানুযায়ী সকলে প্রতিফলনও ঘটাতে লাগল।

পক্ষান্তরে, বনী হাশেম লোকদের জন্য সমাজচ্যুত হয়ে জীবনযাপন করাটা ছিল কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক বিষয়। উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে হাশেমি সর্দার হযরত আবু তালিব বিচলিত না হয়ে হেন কঠিন পরিস্থিতিকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিলেন। আপন ভাতিজা ও তাঁর প্রচারিত দ্বীন ইসলামকে রক্ষার নিমিত্তে তিনি অবিচল থাকলেন। অবশেষে হযরত আবু তালিব মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে স্বগোত্রীয় লোকজন ও পরিবার-পরিজন সমেত মক্কা’র অদূরে পাহাড়ের পাদদেশে একটি উপত্যকায় অবস্থান নিলেন। ইসলামের ইতিহাসে যা “শেবে আবু তালিব” নামে আজও পরিচিত। ঐ স্থানে প্রিয় ভাতিজা ও পরিবার-পরিজন সমেত দীর্ঘ তিন বছর অতিবাহিত করা যে কত কঠিন কাজ ছিল তার কিছু উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

প্রথমত আরবের মক্কা নগরীর সর্দার ও কাবার মোতাওয়াল্লী হয়ে একটি পাহাড়ের পাদদেশে যাযাবরি জীবন ব্যবস্থাকে মেনে নেয়া কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব কি না? তদুপরি ঐ পাহাড়ী অবস্থানে জীব-জন্তু, পোকা-মাকড় ও সাপ-বিচ্ছুযুক্ত পরিবেশে আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দীর্ঘকাল অবস্থান করা কারো পক্ষে সম্ভব কি না? তদুপরি রয়েছে অনাহারে-অর্ধাহারে দিনাতিপাত করার পরিস্থিতি, আবার রয়েছে কাফের মুশরিকদের নজরদারি ও গুপ্ত আক্রমণের আশঙ্কা। আমি অন্তর দিয়ে সালাম জানাই সেই অকুতোভয় মহান ঈমানদার মোমেন, হাশেমি বীর সর্দার হযরত আবু

তালিবকে। যদি সেদিন তিনি তদ্রুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতেন তবে আমরা আমাদের প্রিয় নবী কিংবা ইসলাম-এর কোনোটাই অক্ষত পেতাম না।

এমন অসংখ্য দিবস-রজনী কিংবা হযরত আবু তালিব ও তাঁর পরিবারের লোকেরা অতিবাহিত করেছিলেন সামান্য রুটি ও কিছু ফলমূল খেয়ে। আর অধিকাংশ সময় কেটেছে পাহাড়ী গাছের লতাপাতা আহারের মধ্য দিয়ে। হযরত আবু তালিব এ দীর্ঘ বন্দি জীবনের বহু রাত কাটিয়েছেন নবী (সা.)-কে রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী হয়ে।

অবশেষে তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর, নবী (সা.) চাচা হযরত আবু তালিবকে বললেন চাচাজী আপনি কাফের সর্দার আবু সুফিয়ান, আবু লাহাব, আবু জাহেল, ওতবা ও শাইবাকে গিয়ে বলুন, "তোমরা আমাদেরকে বয়কট করার উদ্দেশ্যে যে শপথপত্র কাবায় ঝুলিয়ে ছিলে, গিয়ে দেখ তা উইপোকায় কেটে নষ্ট করে ফেলেছে। যেহেতু তোমাদের শপথ পত্রেরই অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা আমাদের ওপর যে বয়কট আরোপ করেছিলে তার কি আর কোনো অস্তিত্ব আছে?" কাফের সরদারেরা হযরত আবু তালিবের কথা অনুযায়ী বিষয়টি যাচাই করে দেখল মোহাম্মদের কথা সম্পূর্ণ সঠিক। আর তাতে সকলে লজ্জায় মাথা নত করে বিদায় নিল।[২২]

পাহাড়ের পাদদেশে দীর্ঘ তিন বছর নানা প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থান। তদুপরি খাদ্য ও পানির সার্বক্ষণিক অভাব। নানামুখী যন্ত্রণা ও বিরূপ পরিবেশ পরিস্থিতির শিকার হওয়ার পরেও নবী (সা.)-এর প্রতি আবু তালিবের ঈমান আনার আর কোনো পরীক্ষার প্রয়োজন আছে কি? আমি এখানে একটি উদাহরণ তুলে ধরছি যেমন, কোন ব্যক্তি যদি ফুল ভাল না বাসে। তবে ঐ ব্যক্তি কি ফুলের বাগান সাজানোর জন্য নানা জাতের ফুলের চারা রোপন কিংবা তার পরিচর্যা করবে? নিশ্চয়ই না। তাহলে যদি আবু তালিবের ইসলাম গ্রহণের কোনো ইচ্ছাই না থাকে, তবে কেন তিনি ইসলাম ও তাঁর নবীকে লালন পালনের মতো গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আর জীবনে তাঁকে এর জন্য দিতে হয়েছে চরমমূল্য। হযরত আবু তালিব তাঁর জীবনের সর্বশক্তি দিয়ে রাসূলে আকরাম (সা.)-এর হেফাজত করেছেন এবং আল্লাহর দ্বীন প্রচারে তাঁকে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। কোরাইশ কাফেরদের কথা অগ্রাহ্য করে শেবে আবু তালিবে নবী (সা.) সহ স্বপরিবারে অবস্থান ছিল হাশেমি বংশের জন্য

[২২] আল্ গাদীর, খণ্ড-৭, পৃ-৩৩৩; আল হুজ্জাত, পৃ-৩৭; আল নাজ ওরীয়া, খণ্ড-১, পৃ-২৭৩; মুজামুল বুলদান, খণ্ড-৫, পৃ-২৭০

এক মহা কঠিন পরীক্ষা। এতদসত্ত্বেও তিনি দ্বীন ইসলাম ও তাঁর নবীকে কাফেরদের কাছে মাথনত করতে দেননি।

এক শ্রেনির মুসলমান যদিও বলে থাকেন, যেহেতু নবীজি আবু তালিবের ভাতিজা ছিলেন, তাই তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন এতে তাঁর ঈমান আনার বিষয়টি পরিস্কার হয় না সুতরাং আমি এখানে কিছু সাধারণ যুক্তি উপস্থাপন করছি। যেমন: পিতা-মাতাগণ নিজের প্রাণের চেয়েও তাদের সন্তানদের অধিক ভালোবাসেন এবং নিজের জীবনের বিনিময়েও যদি সন্তান বেঁচে যায় তবে পিতা-মাতা তাতে রাজি হয়ে যান। অনুরূপ ঘটনা যদি আমাদের সমাজে ঘটে তবে তা হবে স্বাভাবিক কিন্তু পিতা-মাতা নিজের সন্তানের পরিবর্তে ভাতিজার জন্য জীবন বাজি রাখা এটা হলো অস্বাভাবিক। আর এটা শুধুমাত্র তারই পক্ষে সম্ভব যার অন্তরে রয়েছে দৃঢ় ঈমান ও নিরঙ্কুশ ভালোবাসা। শেবে আবুতালেবে একঘরে থাকা অবস্থায় কোরাইশ গুপ্তচরেরা উপত্যকায় যাওয়ার পথে সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখতো। যাতে কেউ খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আবু তালিবের পরিবারের কাছে যেতে না পারে। এধরণের নিয়ন্ত্রণ এবং দৃষ্টি রাখা সত্বেও কখনো কখনো বিবি খাদিজার ভাতুষপুত্র হাকীম বিন হিজাম, আবুল আস ইবনে রাবি ও হিশাম ইবনে আমর রাতের গভিরে কিছু গম ও খেজুর সমেত বস্তা একটি উটের ওপর চাপিয়ে উপত্যকার কাছাকাছি আসতেন এবং রশি উটের গলায় পেঁচিয়ে উটটিকে ছেড়ে দিতেন আর উক্ত খাদ্য সামগ্রী নিয়ে উটটি অবরুদ্ধ বনি হাশিম শিবিরে পৌঁছে যেত অতঃপর তাঁরা তা নামিয়ে নিতেন। এধরণের সহযোগিতা করতে গিয়ে অনেক সময় তারা প্রতিরোধেরও সম্মুখিন হতেন।

একবার আবু জেহেল দেখতে পেল যে, হাকীম বিন হিজাম কিছু খাদ্য সামগ্রী উটের পিঠে নিয়ে উপত্যকার পথে রওনা হয়েছেন, তখন সে তীব্রভাবে তাঁর ওপর চড়াও হয়ে বললো, "আমি তোমাকে কোরাইশদের কাছে নিয়ে গিয়ে অপমানিত করবো।" এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি ও বাকবিতন্ডা চলতে থাকে ঐ সময় আবু বুখতুরী, যে ছিলো ইসলামের শত্রু। সে আবু জেহেলের এধরণের আচরণের তীব্র নিন্দা করে বললো, "হাকীম তার ফুফু খাদিজার জন্য খাদ্য নিয়ে যাচ্ছিল এতে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন? তাকে বাধা দেয়ার অধিকার তোমার নেই।" বুখতুরী শুধু এ কথা বলেই ক্ষান্ত হলো না, সে আবু জেহেলকে রাগান্বিত হয়ে লাথিও মারলো। অর্থাৎ আবু জেহেলের অতিরঞ্জিত অমানবিক কর্মকান্ড তার দলীয় লোকেরাও পছন্দ করতো না।

কাবার দেয়ালে চুক্তিপত্র ঝুলানো এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোরাইশদের কঠোর আচরণ মুসলমানদের ধৈর্য্যশক্তি ও মনোবল বিন্দু মাত্র হ্রাস করতে সক্ষম হয়নি। মহানবী (সা.) তাঁর চাচা সর্ম্পকে যে বক্তব্য দিয়েছেন তার কিছু অংশ পাঠকের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করছি। নবী (সা.) বলেন, "আমার চাচাজান তাঁর পুরো পার্থিব জীবন ও অস্তিত্ব দিয়ে আমাকে আগলে রেখেছেন এবং কোরাইশদের নিকট আমার জন্য মারাত্মক ভাষায় চিঠি দিয়ে তাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি কখনোই আমাকে তাঁর সাহায্যদান এবং পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বিরত হবেন না। তাঁর চিঠির একটি অংশ অনুরূপ, "হে মোহাম্মদের শত্রুরা! ভেবোনা যে, আমরা মোহাম্মদকে ত্যাগ করবো, কখোনোই না। সে সর্বদা আমাদের নিকট ও দূর সম্পর্কের সকল আত্মীয়-স্বজনের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও সম্মানিত বনি হাশিমের শক্তিশালী বাহুগুলো তাঁকে সবধরণের আঘাত ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে।[২৩]

ইতিহাসের পাতায় বিভিন্ন সময়ে আমরা যে সকল ব্যক্তির ভালোবাসা ও আবেগ অনুভূতির নিদর্শন দেখতে কিংবা বর্ণনা শুনতে পাই সেগুলোর অধিকাংশই বস্তুবাদি মাপকাঠি এবং বিত্ত-বৈভবকে কেন্দ্র করেই। আর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সেই প্রোথিত ভালবাস ও আবেগ অনুভূতির বহ্নিশিখা নির্বাপিত হয়ে যায়।

আর যেসকল আবেগ ও অনুভূতির ভিত্তি হচ্ছে আত্মিয়তা ও রক্তের বন্ধন অথবা ভালোবাসার প্রিয় ব্যক্তিটি আধ্যাত্মিক পূর্ণতা ও উৎকৃষ্ট গুণাবলির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেই বিশ্বাস ও ন্যায় নিষ্ঠার বহ্নিশিখা কখনো তাড়াতাড়ি নিভে যায় না। অনুরূপ বলা চলে আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর প্রতি আবু তালিবের ভালবসার দুটি উৎস ছিল। প্রথমটি হচ্ছে তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন মোহাম্মদ হচ্ছেন আল্লাহর প্রেরিত একজন ইন্সানে কামেল অর্থাৎ সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ মানব। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে মোহাম্মদ (সা.) তাঁর আপন ভাতিজা।

হযরত আবু তালিব তাঁর নিজ ভাই ও সন্তানের স্থলে নবী (সা.)-কে স্থান দিয়েছেন। মোহাম্মদ (সা.)-এর আধ্যাত্মিকতা ও আত্মিক পবিত্রতায় আবু তালিব এমনই আস্থাশীল ছিলেন যে, যখনই তিনি কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ কিংবা বিপদ-আপদের আশংকা করতেন তখনই তিনি নবী (সা.)-এর স্মরণাপন্ন হতেন এবং তাঁকে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করতেন। আবু তালিব

---

[২৩] চির ভাস্বর মহানবী (সা.), লেখক- আল্লামা জাফর সুবহানী, অনুবাদ- মুনীর হোসেন খান, ১ম খণ্ড, পৃ-৩২৭]

জীবনে কখনোই পার্থিব কোন সম্পদ অর্জন কিংবা দুনিয়াবী কোন স্বার্থ উদ্ধারের নিমিত্তে নবী (সা.)-কে ব্যবহার করেননি।

হযরত আবু তালিবের জীবনী পর্যালোচনায় যে বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হলো শক্তিশালী আস্থা, নিরঙ্কুশ ভালোবাস ও মনের দৃঢ়তা। আর এগুলোর সবগুলোর প্রকাশ পেয়েছে নবী (সা.)-এর লালন-পালন ও অভিভাবকত্বের গ্রহণের শুরু থেকে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করে গেছেন ইসলামের নবী (সা.)-এর হেফাজতে।

সুতরাং এটাই প্রমাণিত আবু তালিব ও ইসলাম পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। অতএব হযরত আবু তালিব সম্পর্কে বিরুপ যাকিছু প্রচার করা হয় তা ঢাহা মিথ্যা, অবাস্তব, কল্পনাপ্রসূত এবং কোনো প্রকার প্রমাণ ছাড়াই।

অসুস্থ চাচার পাশে মোহাম্মদ (সা.)

'শেবে আবু তালিব' থেকে ফেরার প্রায় এক বছরের মধ্যেই হযরত আবু তালিব অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ। নানা প্রতিকূল পরিবেশ আর দুঃশ্চিন্তায় দিন দিন তাঁর শরীরের অবনতি হতে থাকে। নবী (সা.)-এর আট বছর বয়স থেকে শুরু করে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ৪২ বছরের অকৃত্রিম অভিভাবক ও স্নেহময়ী পিতৃব্য চাচার অসুস্থতা নবী (সা.)-কেও অসুস্থ করে তোলে। কারণ এ চাচা নবী (সা.)-কে শুধু লালন পালনই করেননি, ছিলেন ছাঁয়ার মতো নবী (সা.)-এর পাশে আজীবন এবং ভাতিজার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে দিতেও সদা প্রস্তুত ছিলেন।

সেই চাচা আজ অসুস্থ! মারাত্মক রোগাক্রান্ত। নবী (সা.)-এর অন্তর ব্যথায় বিদীর্ণ। ইসলাম ও নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা ভাবনায় নবী (সা.)-কে বিচলিত করে তুলেছে। বিগত দিনগুলোতে চাচার সাহায্য সহানুভূতির চিত্রগুলো একে একে নবী (সা.)-এর মানসপটে ভেসে উঠতে লাগল। আর তখনই চাচার প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা ও হৃদয়ের উষ্ণতা বৃদ্ধিতে নবী (সা.) অশ্রু সজল কান্না কণ্ঠে বললেন, "চাচাজান আমার ও ইসলামের ওপর আপনার সকল এহসান ও অবদান অনন্ত অপরিসীম। আর মুসলমানদের জন্য এই এহসান চির অম্লান হয়ে রইল। যারা আজ আপনার উপস্থিতির কারণে আমাকে কিছু বলার সাহস পায় না। না জানি আপনার অনুপস্থিতিতে কাল তারা আমার সাথে কিরুপ আচরণ দেখায়?"

নবী (সা.) তাঁর চাচার অবদানসমূহের জন্যে মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট তাঁর পরকালীন মুক্তি ও প্রশান্তি কামনা করে প্রার্থনা করেন। আর যতদিন তিনি অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন এক মুহূর্তের জন্যও নবী (সা.) তাঁর স্মরণমুক্ত ছিলেন না।[২৪]

আমি অবাক হয়ে যাই, আমরা মুসলমানগণ যে নবী (সা.)-এর সুপারিশ ও নেক দৃষ্টির প্রার্থনায় দিবারাত্রি ইবাদত বন্দিগী করে যাচ্ছি পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে। স্বংয় নবী (সা.) যখন আপন চাচার কল্যাণ কামনায় সৃষ্টিকর্তার নিকট হাত তুলেছেন তা কীরূপ হতে পারে? তাছাড়া নবী (সা.)-এর হাত তো বিফলে

---

[২৪] আল মানাকিব, খণ্ড-১, পৃ-৩৫; ঈমানে আবু তালিব, পৃ-১৭; আল গাদীর, খণ্ড-৭, পৃ-৩৬৭; মাজমায়ুল বায়ান, খণ্ড-৭, পৃ-৩৭।

যাওয়ার নয়। তাহলে এরা কারা যারা আলেম নাম ধারণ করে হযরত আবু তালিবের ঈমান না আনার নিশ্চয়তা প্রদান করেন এবং তাঁকে কাফের বানিয়ে জাহান্নামে পাঠাতেও দ্বিধা করেননি!

তাই বলছি ঐসকল আলেমগণ কোন ইসলামের অনুসরণ করছে তা শুধু তারাই ভালো জানেন। আমি আমার নবী (সা.) ও ইসলাম সম্পর্কে যে আকীদা পোষণ করছি, তা পাঠকের অবগতির নিমিত্তে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি। আমার নবী (সা.) সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ আল্লাহর রাসূল। তিনি মাসুম নিষ্পাপ। তাঁর হাত সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য। তিনি নির্ভুল। কোরআন ও নবী (সা.)-এর মধ্যে পার্থক্য শুধু এইটুকু, কোরআন গ্রন্থ আর নবী জীবন্ত। অর্থাৎ উভয়ই কোরআন, একে অন্যের পরিপূরক। নবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেননি, তিনি ইন্তেকাল করেছেন। নবী আমাদের মত মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন মানবরূপী অতিমানব। তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত। আর ইসলাম হচ্ছে সত্য, ন্যায় ও শান্তির ধর্ম। যেহেতু নবী (সা.) কারো অবদানকে অস্বীকার করেন না এবং তিনি তাঁর চাচার জন্য আল্লাহর দরবারে হাত তুলেছেন। সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস হযরত আবু তালিব ইন্তেকালের পর হতে আজও জান্নাতের সম্মানিত স্থানে প্রশান্তিতে অবস্থান করছেন ইন্‌শাআল্লাহ।

রাসূল (সা.) এর ভালবাসা, আবু তালেবের ঈমানেরই স্বাক্ষ্য স্বরূপ।

আল্লাহর রাসূল (সা.) বিভিন্ন সময়ে নিজ চাচার প্রশংসা করে তাঁর প্রতি যে সম্মান দেখাতেন এবং ভালবাসা প্রকাশ করেছিলেন, সেই দৃষ্টান্তগুলোর মধ্য থেকে শুধুমাত্র দু'টির প্রতি ইশারা করছি:

ক. কোনো কোনো ঐতিহাসিক নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) তাঁর চাচাতো ভাই আক্বীল ইবনে আবি তালিবকে বলেন: "আমি তোমাকে দু'টি কারণে ভালোবাসি; (প্রথমত) আমার সঙ্গে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে এবং (দ্বিতীয়ত) আমি জানি যে আমার চাচাজান তোমাকে খুব ভালোবাসতেন।"[২৫]

খ. হালাবী তার নিজ গ্রন্থ সীরাতে রাসূল (সা.)-এ বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল (সা.) তাঁর প্রিয় চাচাকে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বলেন- "যতদিন আমার চাচা আবু

[২৫] তারিখুল খামিস।

তালিব জীবিত ছিলেন কুরাইশ কাফেররা ততদিন আমার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারেনি।"[২৬]

এটা স্পষ্ট যে, হযরত আবু তালিবের প্রতি মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা এবং তাঁর সুউচ্চ ব্যক্তিত্বের প্রতি মহানবী (সা.)-এর গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন হযরত আবু তালিবের ঈমানেরই প্রমাণ স্বরূপ। কেননা আল্লাহর রাসূল (সা.) কোরআন ও হাদীসের স্বাক্ষ্য অনুযায়ী কেবল মু'মিনদেরকেই ভালোবাসেন এবং কাফের ও মুশরিকদের ব্যাপারে কঠোর হবেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচররা কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল...।"[২৭]

অন্য এক স্থানে বলা হচ্ছে:

لَّا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوۤاْ آبَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَـٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ

"যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা।"[২৮]

উক্ত আয়াতগুলোর আলোকে এবং হযরত আবু তালিবের প্রতি রাসূল (সা.)-এর গভীর ভালবাসাসহ বিভিন্ন সময়ে চাচার প্রতি তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী প্রশংসা ও সম্মান প্রদর্শনের আলোকে বলা যায়, মহান আল্লাহর রাসূলের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাই প্রমান করে যে, হযরত আবু তালিব সন্দেহাতীত ভাবে খাটি ঈমানদার ছিলেন।

---

[২৬] সিরায়ে হালাবি।
[২৭] সূরা ফাতহ, আয়াত-২৯।
[২৮] সূরা মুজাদালাহ, আয়াত-২২।

হযরত আবু তালিবের ম্যাইয়াতের গোসল
ও
জানাজার নামাজ পড়ান মোহাম্মদ (সা.)

ইসলামের ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয় নবী (সা.)-এর হিজরতের ৩ বছর পূর্বে ৮০ বছর বয়সে হযরত আবু তালিব ইন্তেকাল করেন। এই মহান চাচার মৃত্যুতে নবী (সা.) অত্যন্ত মর্মাহত ও দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। নবী (সা.) নিজে এবং হযরত আলী হযরত আবু তালিবের গোসল সম্পন্ন করেন ও কাফন পরানোসহ ম্যাইয়াতের সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে নবী (সা.) হযরত আবু তালিবের নামাজে জানাজা পড়ান। অতঃপর দাফন সম্পন্ন করে অশ্রুসজল চোখে লোকজনের সম্মুখে দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে বলেন, "হে খোদা আমার প্রাণ প্রিয় চাচা আবু তালিবের প্রতি তোমার দয়া ও করুণা বর্ষণ করো। তিনি আমাকে যেভাবে লালন-পালন ও শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং ছায়া দান করেছেন, সেরূপ তুমিও তাঁর প্রতি তোমার করুণা বর্ষণ ও ছায়া দান করো। কবরের সকল অনিষ্ট থেকে তাঁকে রক্ষা করে। তাঁর প্রতি জান্নাতের শীতল ছায়া নসিব করো। তিনি যেমন আমার সাহায্যকারী ও অভিভাবক ছিলেন, হে খোদা তুমিও তাঁর সাহায্যকারী ও অভিভাবক হয়ে যাও।"

অবশেষে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বললেন, "যতদিন আমার চাচাজান জীবিত ছিলেন, ততদিন কেউ আমাকে উত্যক্ত করতে পারেনি। এখন তারা আমার সাথে যে যার মতো আচরণ করবে। চাচাজানের মৃত্যু আমার জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হে খোদা তোমার পক্ষ হতে আমার প্রতি ধৈর্য সাহস ও শক্তি প্রদান করো।"[২৯]

এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ্য, হযরত আবু তালিব যে পরিপূর্ণ ঈমানদার ও মুমিন ছিলেন তার কিছু নিদর্শন উল্লিখিত ঘটনায় বিদ্যমান। যেমন কোনো নবী-রাসূল কাফের মুশরিকদের মাগফেরাত কামনায় আল্লাহর দরবারে হাত তুলেননি। সাইয়্যেদুল মুরসালিন তাঁর জন্য হাত তুলেছেন। কোনো নবী-রাসূল কাফের মুশরিকদের জানাজা পড়াননি। নবী (সা.) তাঁর জানাজা পড়েছেন। কোনো নবী-

[২৯] সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, ই:ফা:, ১ম খণ্ড, পৃ-২৩; তারিখে কামেল, সাইয়েদুল আওছিয়া, পৃ-১০।

রাসূল কাফেরদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেননি। সমগ্র দুনিয়ায় স্বীকৃত যে, হযরত আবু তালিব ছিলেন নবী (সা.)-এর একান্ত অভিভাবক। সুতরাং আকল বুদ্ধি বিবেচনা ও কোরান, হাদীসের পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবু তালিব ছিলেন নবী (সা.)-এর প্রিয়ভাজন ঈমানদার ও মুমিন ব্যক্তিত্ব।

তাহলে যারা এই মহান ব্যক্তির ঈমান না আনার প্রচারণা চালাচ্ছেন। তারা হযরত আবু তালিবের ঈমানী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদের ঈমানী কর্মের কিছু অংশ পরখ করে দেখুন না, তাতে নবী (সা.) কিংবা ইসলাম কতটুকু উপকৃত হয়েছে। নিশ্চই আপনারা তা বুঝতে পারবেন। নবী (সা.) ও ইসলামের জন্য হযরত আবু তালিবের কর্মকাণ্ডের সামান্য কিছু অংশ উপস্থাপন করছি :

হযরত আবু তালেব ইসলামের নবী মোহাম্মদের সকল দায়-দায়িত্ব মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত পালন করেছিলেন। তিনি নবী ও ইসলামের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, অর্থ, অস্ত্র ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার মতো সুসজ্জিত বাহিনী, নবী (সা.)-এর সেবায় দান করেছেন। আবার মহানবী (সা.)-এর ওপর কাফের বাহিনীর রণমহড়ার জবাবে আবু তালিব হাশেমি বংশের বীর জোয়ান ও নিজ পরিবারের সদস্য সমেত বিশাল বাহিনী নিয়ে কাফেরদের সমুচিত জবাব প্রদানে দেরি করেননি। এভাবে হযরত আবু তালিব নবী (সা.) ও ইসলামের সেবায় সদা প্রস্তুত ছিলেন।[৩০]

তাই ঐসকল আলেমদের বলছি, আপনাদের পক্ষে আবু তালিবের অনুরূপ কিছু করা সম্ভব কি? অথচ সত্য চিরভাস্বর আর মিথ্যা চির ম্লান।

---

[৩০] শায়খুল আবতাহ, পৃ-৪৩; তাজকেরাতুল খাওয়ায়েস, পৃ-১০; আল গাদীর, খণ্ড-৭, পৃ-৩৭৪।

শাজারায় আবু তালিবই
শাজারায়ে মোহাম্মদ (সা.)

‘শাজারা’ একটি আরবি শব্দ এর অর্থ হচ্ছে গাছ। এই গাছের সহিত মানুষের বংশ বিস্তার কিংবা বংশীয় ধারার মিল রয়েছে। যেমন একটি মাত্র বীজ থেকে যদিও বট বৃক্ষের মতো একটি বিশাল গাছের সূচনা হয়ে থাকে, তবে যখন তা পূর্ণাঙ্গ আকার ধারণ করে তখন তা পরিবেশ সমাজ তথা মানুষের কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। আর এই গাছের মূল থেকে শুরু করে ডাল-পালা শাখা-প্রশাখা কাণ্ড ও পাতার বিস্তৃতি তার বিশালতার বার্তাই প্রকাশ করে। আবার এই গাছ থেকেই সৃষ্টি হয় অসংখ্য গাছের বীজ।

অনুরূপ মানব জাতি এক আদম থেকেই সৃষ্টি যেমন সত্য। তেমনই এর রয়েছে নানা রূপ-বর্ণ-গোত্র, জাতিসত্ত্বা ও ভাষার বৈচিত্রতা। এতে ভিন্নতা রয়েছে কৃষ্টি-কালচার ও সামাজিকতায়, ভিন্নতা রয়েছে শাজারা কিংবা বংশীয় ধারাতেও। মহান আল্লাহপাক তাঁর রেসালাতের ধারাকে কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রাখার নিমিত্তে নবী রাসূল ও ইমামদের শাজারা অর্থাৎ বংশীয় ধারাকে সর্বতোভাবে পূতপবিত্র রেখেছেন এবং এটি আল্লাহর বিশেষ নূরের ধারা যা নবী আদম (আ.) থেকে ইমাম মাহদী (আ.) পর্যন্ত প্রবাহিত।

কোন কোন নবী রাসূল ও ইমাম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। আবার কেউ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আবার অনেকে প্রশাসনিক পদে না থাকলেও জাতির কাছে ছিলেন সম্মানের সর্বোচ্চ আসনে। যেমন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.), নবী দাউদ (আ.), নবী সোলায়মান (আ.) তাঁরা প্রত্যেকেই যাঁর যাঁর সময়ে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন। নবী ইউসুফ (আ.) তাঁর সময়ে রাষ্ট্রের খাদ্য ভান্ডারের দায়িত্বে অর্থাৎ খাদ্য মন্ত্রী ছিলেন। আবার ইমাম আলী (আ.) ও ইমাম হাসান (আ.) উভয়েই রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন।

যদি আমরা একটু ইতিহাসে ফিরে যাই তবে দেখতে পাব যে, মহান আল্লাহ পাক কাবার দায়িত্ব বরাবরই কোরাইশ বংশীয় হাশেমিদের হাতে ন্যস্ত রেখেছেন। যারা সমাজের সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে অলংকৃত ছিলেন। অর্থাৎ

নবী ইব্রাহীম (আ.)-এর পরবর্তিতে তাঁরই বংশীয় ধারায় কাবার কর্তৃত্ব হাশেমিদের হাতেই বিদ্যমান ছিল। আর এ ধারাতেই রয়েছে অসংখ্য নবী-রাসূল-ইমাম ও কাবার মোতাওয়াল্লি। তাঁদেরই বংশীয় পরিচয় কিংবা শাজরা নিম্নে তুলে ধরছি।

আল্লাহর নূর প্রথমে নবী আদম (আ.)-এর ছুলবে/পেশানীতে অন্তঃরীত হয়। পরে তাঁর থেকে নিম্নে বর্ণিত ধারায় প্রবাহিত হয়ে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।[৩১]

হযরত আদম (আ.)

↓

হযরত শীশ (আ.)

↓

হযরত আনুশ (আ.)

↓

হযরত ক্বিনান (আ.)

↓

হযরত মাহলায়িল (আ.)

↓

হযরত ইল ইয়ারাদ (আ.)

↓

হযরত আখনুখ (আ.)

↓

হযরত মুতাওশশিলাখ (আ.)

↓

হযরত লামাক (আ.)

↓

হযরত নূহ (আ.)

↓

---

[৩১] আদ্দামায়াতু সাবেকা, খণ্ড-১, পৃ-১৯৫।

হযরত সাম (আ.)

↓

হযরত আরফাখশাদ (আ.)

↓

হযরত শালেখ (আ.)

↓

হযরত আবীর (আ.)

↓

হযরত ফালিগ (আ.)

↓

হযরত আরশু (আ.)

↓

হযরত শুরুগ (আ.)

↓

হযরত নাখুর (আ.)

↓

হযরত তায়াররুখ (আ.)

↓

হযরত ইব্রাহীম (আ.)

↓

হযরত ইসমাইল (আ.)

↓

হযরত ক্বিদার (আ.)

↓

হযরত হামাল (আ.)

↓

হযরত নাবাত (আ.)

↓

হযরত সালামান (আ.)

↓

হযরত ইসহাক (আ.)

↓

হযরত ইয়াকুব (আ.)

↓

হযরত ইউসুফ (আ.)

↓

হযরত ইমরান (আ.)

↓

বিবি মরিয়ম (সা: আ:

↓

হযরত হামীশা (আ.)
↓
হযরত আলীয়াসা (আ.)
↓
হযরত আদু (আ.)
↓
হযরত আওদ (আ.)
↓
হযরত আদনান (আ.)
↓
হযরত মাআদ (আ.)
↓
হযরত নায্যার (আ.)
↓
হযরত মুদির (আ.)
↓
হযরত ইল ইয়াসা (আ.)
↓
হযরত মুদরিকাহ (আ.)
↓
হযরত খুযাইমাহ (আ.)
↓
হযরত কেনানাহ (আ.)
↓
হযরত নযর (আ)
↓
হযরত মালিক (আ.)
↓

হযরত ঈসা (আ:)

- হযরত ফেহের (কোরাইশ)
- ↓ হযরত গালিব (কোরাইশ)
- ↓ হযরত লুয়াই (কোরাইশ)
- ↓ হযরত কাআব (কোরাইশ)
- ↓ হযরত মুররাহ (কোরাইশ)
- ↓ হযরত কিলাব (কোরাইশ)
- ↓ হযরত কোসাই (কোরাইশ)
- ↓ হযরত আবদে মানাফ (কোরাইশ)
- ↓ **হযরত হাশেম** (কোরাইশ)
- ↓ **হযরত আব্দুল মোতালিব** (কোরাইশ)
  - ↓ **হযরত আব্দুল্লাহ** (কোরাইশ)
    - ↓ **হযরত মোহাম্মদ (সা.)**
    - ↓ **হযরত ফাতেমা যাহরা (সাঃ আঃ)** → **হযরত ইমাম আলী (আ.)**
      - ↓ ইমাম হাসান (আ.)
      - ↓ ইমাম হোসাইন (আ.)
  - ↓ **হযরত আবু তালিব** (কোরাইশ)
    - ↓ **হযরত ইমাম আলী (আ.)**

↓

ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.)

↓

ইমাম মোহাম্মদ বাকের (আ.)

↓

ইমাম জা’ফর সাদিক (আ.)

↓

ইমাম মূসা কাজিম (আ.)

↓

ইমাম আলী রেজা (আ.)

↓

ইমাম মোহাম্মদ তাকী (আ.)

↓

ইমাম আলী নাকী (আ.)

↓

ইমাম হাসান আসকারী (আ.)

↓

ইমাম মোহাম্মদ আল মাহ্দী (আ.)

উল্লিখিত শাজারায় যে বিষয়টি লক্ষনীয় তা হচ্ছে আবু তালিবের পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে অসংখ্য নবী-রাসূল রয়েছেন। আবার রয়েছেন কাবার মোতাওয়াল্লী, যা তিনি নিজেও ছিলেন। সম্মানিত পাঠকগণ যদি গভীর ভাবে লক্ষ্য করেন তাহলে অনুধাবন করা সহজতর হবে যে, হযরত আবু তালিবের ভাতিজা মোহাম্মদ (সা.) সকল নবী-রাসূলের সর্দার ও জান্নাতের মালিক। যাঁর লালন-পালনকারী ছিলেন আবু তালিব স্বয়ং। আবু তালিবের সন্তান হযরত আলী, যিনি প্রিয় নবী (সা.)-এর ‘ওয়াসী’ ছিলেন। যিনি ‘কুল্লে ঈমান’ ছিলেন, যিনি ‘জ্ঞান নগরীর দরজা’ ছিলেন। যিনি ছিলেন নবী (সা.)-এর উপযুক্ত ‘জানাশীন’। তাঁর সম্পর্কে

নবী (সা.)-এর অসংখ্য হাদীস রয়েছে। নবী (সা.) বলেছেন, "আলী হচ্ছে সৃষ্টি কূল সেরা"।[৩২] রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, "আলী কোরআনের সাথে আর কোরআন আলীর সাথে"।[৩৩]

হযরত আলী ইমামতের প্রথম ইমাম ও তাঁর বংশে ১১ জন ইমামের আর্বিভাব হবে। শেষ ইমামের নাম হবে মোহাম্মদ আল মাহ্দী। তাঁর চেহারা নবী (সা.)-এর চেহারার সাদৃশ্য, দ্বীন ইসলাম তাঁরই মাধ্যমে অন্য সকল দ্বীনের ওপর জয়লাভ করবে। পাঠকের জ্ঞাতার্থে আমি এখানে কয়েকটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, হযরত আবু তালিবের পুত্র হযরত আলী রাসূল (সা.)-এর দ্বীনকারী পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম এবং তিনিই নবীজীর প্রথম সাহাবী। হযরত আবু তালিবের পুত্রবধূ নবী (সা.)-এর কলিজার টুকরা মা ফাতেমা জাহ্রা সালামুল্লাহ আলাইহা, তিনি জান্নাতে নারীদের সর্দার ও জগতের শ্রেষ্ঠ মহিয়সী নারী। আবু তালিবের দুই নাতি ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন মালিকে দোজাহান রাসূলে পাক (সা.)-এরও নাতি, যাঁরা হচ্ছেন জান্নাতে যুবকদের সর্দার। এবার পাঠক বিবেচনা করে দেখুন হযরত আবু তালিবের মর্যাদা কিরূপ হতে পারে?

---

[৩২] আল ইমাম আলী (আ:), ইবনে আসাকির, খণ্ড-২, পৃ-৪৪৩।

[৩৩] আল মুস্তাদার হাকেম, খণ্ড-৩, পৃ-১২৪; কানযুল উম্মাল, খণ্ড-১১, পৃ-৬০৩।

হযরত আবু তালিবের নামে বিভ্রান্তি প্রচারের কারণসমূহ

আইয়্যামে জাহেলিয়াতের সময় মহান আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক নবী মোহাম্মদ (সা.)-কে এই ধরণীর মাঝে প্রেরণ করেন। সমগ্র দুনিয়া স্বীকৃত যে, নবী-রাসূলগণের শাজারা বা বংশধারা নিশ্চিত ভাবে পূত-পবিত্র। যদিও বহু মানুষের মাঝে এ ধারণাটি বিদ্যমান যে, নবীজী আমাদের মতোই মানুষ ছিলেন(!) আসলে ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। কারণ আমাদের মাঝে রয়েছে ভুল-ভ্রান্তি সহ নানাবিধ অসংগতি ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ প্রবণতা। আর পবিত্র কোরআনের সূরা নাজমের ১ থেকে ৪ নং আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর নবী সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছেন:

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ

إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ

“নক্ষত্রের কছম যখন তা অস্ত যায়, তোমাদের সাথি ভুল করে না পথ ভ্রষ্ট হয় না এবং নিজের নফ্‌সের তাড়নায় কথা বলে না। তাঁর কাছে ওহী প্রত্যাদেশ হয়”।

অর্থাৎ যা কিছু বলেন ওহি থেকে বলেন। উল্লিখিত আয়াতটিতে সাহাবিদের উদ্দ্যেশ করে বলা হয়েছে, তোমাদের সাথি ভুল করে না। অর্থাৎ সাহাবিদের কিছু অংশ মনে করতেন নবী (সা.) তাদের মতোই সাধারণ মানুষ। তাই মহান রব্বুল আলামিন তাঁর নবী সম্পর্কে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন ঐ সকল সাহাবির ধারণা সঠিক নয়। তাহলে নবী (সা.) আমাদের মতো মানুষ হলেন কী করে?

তবে হ্যাঁ নবী (সা.) অবয়বে মানুষ সাদৃশ্য, কিন্তু তাঁর সৃষ্টির মাঝে রয়েছে আল্লাহর বিশেষ নূর। আর আমরা অনুরূপ নই। সুতরাং সকল নবী, রসূল ও ইমামদের সৃষ্টিতে রয়েছে আল্লাহর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আর মানুষের সৃষ্টিতে রয়েছে সাধারণ ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। যেমন পবিত্র কোরানের সূরা ওয়াকেয়ার ৭ থেকে ১০ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে :

وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاَثَةً

فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ

وَأَصْحَابُ ٱلْمَشْأَمَةِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْمَشْأَمَةِ

وَٱلسَّابِقُونَ ٱلسَّابِقُونَ

"তোমরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। যারা ডান দিকের তাঁরা কত ভাগ্যবান। আর যারা বাম দিকের তারা কতই না হতভাগা। আর অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই, তাঁরাই নৈকট্যশীল"।

উল্লিখিত আয়াতে কিয়ামত পরবর্তি ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা রয়েছে। আর এতেই প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণ সৃষ্ট্য পর্যায়ের মানুষ কখনও অগ্রবর্তীগণের দলভূক্ত হতে পারবে না। তবে সাধারণ পর্যায়ের তারাই অসাধারণদের দলভূক্ত হতে পারবেন। যাঁদের রয়েছে ধৈর্য, ন্যায়-নিষ্ঠা, সৎকাজ ও ক্ষমা প্রবণতা। তাঁরাই হচ্ছেন ডানদিকস্থ। আর নবী-রাসূল-ইমামগণ হচ্ছেন অগ্রবর্তীগণ।

তবে আমি যে ইমামগণের কথা বলছি তাঁরা কিন্তু মসজিদের ইমাম নন। তাঁরা হচ্ছেন আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত মানব জাতির নেতৃত্ব দানকারী দ্বীন ইসলামের ইমাম। যেমন নবী ইব্রাহীম (আ.) যখন আল্লাহর দেয়া কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন তখন আল্লাহ পাক বললেন:

قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً

"আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য ইমাম মনোনীত করলাম"[৩৪]

উল্লিখিত আয়াতে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, যখন তিনি ইমাম মনোনীত হলেন, তার পূর্বে তিনি নবী ছিলেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছে ইমামের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই নবী ইব্রাহীম (আ.) ছিলেন ইমামতের ইমামগণের মডেল। আর দায়িত্বপ্রাপ্ত ইমামগণ হচ্ছেন, ইমাম আলী থেকে ইমাম মাহ্দী (আ.) পর্যন্ত মোট বার জন ইমাম। আমাদের সকল মাজহাব তথা ধর্মের লোকেরা জানেন যে, শেষ জামানায় একজন ইমামের আবির্ভাব ঘটবে, তিনি হচ্ছেন ইমাম মাহ্দী (আ.)। তিনি অন্ধকারাছন্ন পৃথিবীতে আলোর উন্মেষ ঘটাবেন এবং পাপে নিমজ্জিত পৃথিবীকে পূর্ণতার আলোয়ে উদ্ভাসিত করবেন। আর তিনি ন্যায় ও শান্তির মানদণ্ড স্থাপন করবেন।

---

[৩৪] সূরা-বাকারা, আয়াত-১২৪।

যে বিষয়টি বলার জন্যে আমাকে উল্লিখিত ঘটনাসমূহের অবতারণা করতে হলো। তা হচ্ছে, প্রথমত জাহেলী যুগ ও তৎপরবর্তী সময়ে মহানবী (সা.)-কে সেই সময়কালীন কাফের-মুশরিক ও নব্য মুসলমানগণ কোন প্রকার মেনে নিলেও পরবর্তী সময়ে যখন তিনি বিদায় হজ্ব শেষে 'গাদীর-এ-খোম' নামক স্থানে সোয়া লক্ষ হাজীদের মহাসমাবেশে তাঁর পরবর্তী কালে ইসলামের দিক নির্দেশনা ও ওয়াসীর ঘোষণা দিলেন এবং তিনি বললেন, "আমি তোমাদের মাঝে দুটি ভারি বস্তু রেখে যাচ্ছি একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব অপরটি আমার ইতরাতে আহলে বাইত"।[৩৫]

এই বলে হযরত আলীর হাত উঁচিয়ে ধরলেন এবং তাৎক্ষনিক উচ্চারণ করলেন, "আল্লাহ আমার মাওলা, আমি মোমিনদের মাওলা, আমি যার যার মাওলা এই আলীও তাদের মাওলা।"[৩৬]

সেদিন অনেকেই এ বিষয়টিকে মেনে নিতে পারেননি। কারণ শাসন ক্ষমতা ও নবুয়্যত দুটোই এতদিন হাশেমিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এখন আবার নবী পরবর্তী সময়ে তা চলে যাচ্ছে ইমাম আলী ও তাঁর সন্তানদের নিয়ন্ত্রণে। তাহলে তো পুরো বিষয়টি মোহাম্মদ ও তাঁর বংশীয় লোকদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। সেদিন যাদের অন্তরে এ বিদ্বেষের দানা বেঁধেছিল, তারাই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছিল নবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর। এর সাক্ষ্য মিলে সেই সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ থেকে।

আমি এখানে শুধু ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছি। প্রিয় নবী (সা.)-এর দাফন সম্পন্ন হতে দেরি হয়েছিল ৩ দিন। সামান্য কিছু সাহাবী ব্যতীত অধিকাংশ সাহাবী ছিলেন অনুপস্থিত। নবী (সা.)-এর মক্কা বিজয়ের পর যারা মুসলমান ও সাহাবী হয়েছেন, তাদের এক বিরাট অংশ নবী পরবর্তী সময়ে নবী বংশের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যেমন আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের পূর্বে কাফের থাকা অবস্থায় নবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে ২৬টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি ও তার পুত্র মুয়াবিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। উভয়ে রাসূল (সা.)-এর সাহাবী হয়ে পরবর্তী সময়ে হযরত আলী ও ইমাম হাসানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধে লিপ্ত হন। ইসলামের ইতিহাসে মুয়াবিয়া দু'টি বৃহৎ যুদ্ধে হযরত আলীর বিরুদ্ধে

[৩৫] নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা, মাওলানা মাহমুদুল হাসান, পৃ-৬০; সহীহ আল বোখারী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪১৩

[৩৬] আশারা-মোবাশ্শরা, পৃ-১৬০; তাফসীরে ইবনে ক্বাছির, ৩য় খণ্ড, অনুবাদ, মাওঃ আখতার ফারুক, প্রকাশক ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

ভূমিকা রাখেন। একটি জঙ্গে জামাল ও অপরটি জঙ্গে সিফ্ফীন। প্রথমটিতে মুয়াবিয়া সরাসরি জড়িত না থাকলেও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। আর দ্বিতীয়টিতে হাজার হাজার লোকের প্রাণহানি, বর্শার মাথায় কোরআনের পাতা বিধ্য ও শালিশী প্রতারণার মাধ্যমে, নিশ্চিত পরাজয় ঠেকানোর নিমিত্তে হযরত আলীকে যুদ্ধ বন্ধে বাধ্য করেন।

আমি ভেবে পাই না হযরত আলী ও মুয়াবিয়া উভয়ই যদি হকের ওপর থাকেন তাহলে যুদ্ধ কিংবা হাজার হাজার লোকের প্রাণহানি কেন? পবিত্র কোরানের কোথাও হকের সাথে হকের যুদ্ধের কথা উল্লেখ নাই। অথচ আমাদের আলেম-ওলামা বলেন, "উভয়ই হকের ওপর ছিলেন"।

যদি হযরত আলী এবং মুয়াবিয়া উভয়ই হকের ওপর ছিলেন, তাহলে প্রশ্ন থেকেই যায়? ঐ দুই যুদ্ধের প্রথমটিতে মৃত্যুবরণ করেন ২০ হাজার লোক ও পরেরটিতে মৃত্যুবরণ করেন ৭০ হাজার লোক। তাহলে এ সকল লোকের মৃত্যুর জন্য কে বা কারা দায়ী? আর যদি কেউ দায়ী না হন, তবে কি তাদের মৃত্যু অযথা? এমন অনৈতিক অসঙ্গগতিপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা নিশ্চই কোন আকল জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ মেনে নিতে অপারগ। আর তখনই যারা অন্তত বিবেকসম্পন্ন তাদের অন্তরে সাড়া দিবে, "ডালমে কুচ কালা হ্যায়।" বাস্তবেও তাই, অর্থাৎ এখানে প্রকৃত ইসলাম ও নামধারী ইসলাম এই দুটোকে কৌশলে এক করে দেয়া হয়েছে।

নবী (সা.) থাকাকালীন ইসলামের শত্রু ছিল, নবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পরেও ছিল, আজও আছে। তবে কিছুটা পার্থক্য চোখে পড়বে যেমন, নবী থাকাকালীন ইসলাম বিরোধী কাফের মুশরিকরা সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছে। আর অনেকে ইসলামও গ্রহণ করেছে। কিন্তু নামধারী ইসলাম গ্রহণকারী মুনাফেকরা নবী থাকা অবস্থায় সরাসরি যুদ্ধে না জড়ালেও তাদের নানাবিধ অপকর্মের দরুন মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁর নবীকে বিভিন্ন সময়ে সতর্ক করেছেন। যার সাক্ষ্য মেলে পবিত্র কোরানের সূরা মুনাফিকুনে। দুঃখজনক হলেও সত্য ইসলাম সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই মুনাফিকদের দ্বারাই। যাদের দেখলে মনে হয় মুসলিম কিন্তু কর্মকাণ্ড কাফেরের চেয়েও নিকৃষ্ট।

পাঠক পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে আমি ঐতিহাসিক কিছু ঘটনা তুলে ধরছি। যারা ইসলামের নামে অনৈসলামিক কার্যক্রম কায়েম করে অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছে খোদ নবী বংশের লোকদের ওপর। যেমন চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর সময় ও পরবর্তী সময়ে হযরত ইমাম হাসান থেকে চুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা

গ্রহণের পর আমীরে মুয়াবিয়া চুক্তির সকল শর্ত ভঙ্গ করেন। প্রসাশনে নিজ বংশীয় অযোগ্য লোকদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল করেন। পবিত্র জুম্মার দিনে নামাজের খোতবায় মসজিদে মসজিদে হযরত আলী ও তাঁর সন্তানদের ওপর গালমন্দ করার প্রথা চালু করেন। যাহা দীর্ঘ ৮৩ বছর পর ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসনামলে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। আল্লাহর রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত ফেতরা এক'সার পরিবর্তে মুয়াবিয়ার শাসন আমলে তা আধা'সা নির্ধারন করা হয়। ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলেও মুয়াবিয়া তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতেন না। মুয়াবিয়া তার পরবর্তী সময়ে নিজ পুত্র ইয়াজিদকে ক্ষমতায় বসানোর নিমিত্তে নামী দামি লোকজন ও গোত্র প্রধানদের স্বীকৃতি আদায়ে অর্থ বল ও ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। মুয়াবিয়া নিজের ব্যক্তিগত কাজে রাষ্ট্রীয় অর্থ সম্পদ ব্যয় করতেন। মুয়াবিয়া জাল হাদীসের প্রচলন, প্রসার ও বিস্তার ঘটান। মুয়াবিয়া নব্য মুসলমানদের ওপর জিজিয়া কর আরোপ করেন।

এমন অসঙ্গতিপূর্ণ বেশ কিছু কার্যক্রম মুয়াবিয়া ও তদীয় পুত্র ইয়াজিদ কর্তৃক ইসলামের নামে প্রচার ও প্রসার লাভ করে। ঐসময়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইয়াজিদ নিজের নামের সঙ্গে 'আমীরুল মুমিনীন' টাইটেল ব্যবহার করে। যদি আমরা একটু পেছনে ফিরে যাই তবে সহজেই অনুমেয় যে, নবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হন আবু সুফিয়ান। তার পুত্র মুয়াবিয়া সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হন ইমাম আলী ও ইমাম হাসানের বিরুদ্ধে। মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয় ইমাম হোসাইনের বিরুদ্ধে।

এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল, হাশেমি ও উমাইয়া গোত্রের মধ্যে। উমাইয়াদের বরাবরই বিদ্বেষ ছিল কেন তাদের মধ্যে নবী আসেননি? তাদের মতে হাশেমিদের মধ্যে 'নবুয়াত' ও 'খেলাফত' দুটিই থাকা সমীচীন নয়। সুতরাং একটা অন্তত তাদের চাই। আর এই কারণেই যত শক্রতা, হানাহানি, জোর-জুলুম, খুন-খারাবী ও মিথ্যার প্রচার প্রচারণার ধারাবাহিকতা দৃশ্যমান।

আরব জনগণ হাশেমিদের ওপর সন্তুষ্ট থাকার মূল কারণ ছিল, তাঁরা ছিলেন উদার, ন্যায়পরায়ণ ও খোদাভীরু। তাঁরা কখনো মানুষের ওপর জুলুম করেননি। আবার জালেমদের শাস্তি প্রদানেও তাঁরা পিছপা হননি। যে কারণে সাধারণ মানুষ হাশেমিদের পক্ষাবলম্বী ছিলেন সর্বযুগে। আর এটাও ছিল উমাইয়াদের বিদ্বেষের আরেকটি কারণ। কেন সকলে হাশেমিদের পক্ষাবলম্বী হবে?

স্বয়ং আল্লাহ কিংবা রাসূলও যদি হযরত আলী ও তাঁর সন্তানদের প্রশংসা করে তবে তা মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে, (নাউজুবিল্লাহ) হযরত আলীর মর্যাদা যদি আকাশচুম্বী হয়ে যায়, তবে তা ধূলিস্মাৎ করতে হলে তাঁর মুমিন পিতাকে কাফের বানাতে হবে। আর এর জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন তার বিন্দুমাত্র কমতি হয়নি। জাল হাদীস তৈরি, মিথ্যা ইতিহাস রচনা, উমাইয়া আলেমে দ্বীন তৈরির কারখানা সৃষ্টিসহ নানাবিধ কার্যক্রমের কোনটাতেই মুয়াবিয়া পিছিয়ে ছিলেন না।[৩৭]

মুয়াবিয়ার প্রশংসা করতে গিয়ে, মওলানা শিবলী নোমানী তার সিরাতুন নবী গ্রন্থে রাসুলের পরবর্তীতে বার জন খলিফার নাম উল্লেখ করতে গিয়ে ৫ ও ৬ নম্বরে মুয়াবিয়া ও ইয়াজিদকে অন্তর্ভূক্ত করে ‘রাজিআল্লাহু আনহু’ বলতেও দ্বিধাবোধ করেননি। এসব হচ্ছে তথ্য ও ইতিহাস বিকৃতির সুস্পষ্ট নমুনা।

---

[৩৭] কারবালা ও মুয়াবিয়া, পৃ-৪২-৬৪; নবী বংশ পরিচিতি ও মহান কোরবানি, পৃ-১২১-১২৪; নবী (সা.)-এর আহলে বাইত-এর অনুসরণ কি অপরিহার্য? এম. রহমান, পৃ-১৫০-১৫৭; খেলাফত ও রাজতন্ত্র, পৃ-১৩০-১৩৪, ১৩৭-১৪৪, ১৪৬-১৫৭; সিরাতুন নবী, আল্লামা শিবলী নোমানী, পৃ-৭২-৭৩।

হাদীসে দ্বাহদ্বাহ'র পর্যালোচনা

এটা সুস্পষ্ট হযরত আবু তালিব ঈমানদার ছিলেন। যেসব অন্যায় ও অবৈধ অপবাদ তাঁর ওপর আরোপ করা হয়েছে, সেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসিদের কিছু শাসকের উস্কানিতে এসব অপবাদ প্রচার করা হয়েছে। বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসি শাসকরা সর্বদা মহান আহলে বাইত ও হযরত আবু তালিবের সন্তানদের সঙ্গে শত্রুতা করে এসেছেন।

তাই এ বিষয়টি স্পষ্ট করা জরুরি। আর তা হলো- রাসূল (সা.)-এর একনিষ্ঠ সাথী হযরত আবু তালিবে'র ব্যক্তিত্ব খর্ব করার যে অপচেষ্টা শত্রুরা করেছিল সেটা হাদিসে "দ্বাহদ্বাহ" নামে পরিচিত। এই হাদিসটি পবিত্র কোরআন ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক নানা দলিলের আলোকে ভিত্তিহীন।[৩৮]

কিছু কিছু লেখক যেমনঃ সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে, 'সুফিয়ান ইবনে সাঈদ সুরী', 'আব্দুল মালেক ইবনে উমাইর', 'আব্দুল আযিয ইবনে মুহাম্মাদ দুরাওয়ারদী এবং 'লাইস ইবনে সাঈদ' থেকে নিম্নোক্ত দু'টি কথা রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন;

ক. তাঁকে (আবু তালিবকে) আগুনের মধ্যে পেলাম অতঃপর তাকে দ্বাহদ্বাহ'তে স্থানান্তরিত করলাম। (আমার খাতিরেই তাকে আগুনের অগভীর অংশে আনা হয়েছে, তা না হলে তাকে আগুনের সবচেয়ে গভীর অংশে রাখা হত!)

খ. হয়তো বা কেয়ামতের দিন আমার শাফায়াত তাঁর (আবু তালিবের) কাজে আসবে। তাই তাকে জাহান্নামের আগুনের একটি অগভীর গর্তে রাখা হবে যে আগুনের উচ্চতা তাঁর পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছাবে কিন্তু এতেই তার মগজ (টগবগ করে) ফুটতে থাকবে।" উল্লেখিত বর্ণনা দুটি কল্পনা প্রসূত ও আকল বিবর্জিত। কারন আগুন গভীর কিংবা অগভীর যাই হোক না কেন, এতে নিশ্চিত কোনো প্রশান্তি নেই, উপরোন্তু মগজ টগবগের বর্ণনা রয়েছে। আবার বলা

---

[৩৮] সহীহ আল-মুসলিম, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম প্রকাশঃ জুন-১৯৯৯, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ইমান, অনুচ্ছেদ-৭৯, পৃ-৩৫২, হাদীস নং-৪১৮ থেকে ৪২৪; একই গ্রন্থে অনুচ্ছেদ-১০, পৃ-১১৪, হাদীস নং-৪০ থেকে ৪৩।

হয়েছে, হয়তোবা অর্থাৎ নবী (সা.) তাঁর শাফায়াত সম্পর্কেও নিশ্চিত নন। এত বর্ণনাকারীর জ্ঞানের অসরতাই সুস্পষ্ট। তাহলে নবীজীর নাম করে এমন উদ্ভট কিচ্ছা প্রচারের যৌক্তিকতা কতটুকু পাঠক চিন্তা করুন।

যদিও হযরত আবু তালিব যে ঈমানদার ছিলেন তার সপক্ষে অসংখ্য রেওয়ায়েত ও স্পষ্ট দলিলগুলো হাদীসে দ্বাহদ্বায় আরোপিত অন্যায় অপবাদের ভিত্তিহীনতাই প্রকাশ করেছে, তারপরও আরো বেশি স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে এখানে দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে হাদিস-এ 'দ্বাহদ্বাহ'র পর্যালোচনা তুলে ধরা হলঃ

১। সনদগত ভিত্তিহীনতা।
২। আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের সঙ্গে এই (মিথ্যা) হাদিসটির বৈপরীত্য।

হাদীসে দ্বাহদ্বাহ'র সনদগত ভিত্তিহীনতা :

যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, হাদিসে দ্বাহদ্বাহ-এর বর্ণনাকারীরা হলেন যথাক্রমেঃ 'সুফিয়ান ইবনে সাঈদ সুরী', 'আব্দুল মালেক ইবনে উমাইর', 'আব্দুল আযিয ইবনে মুহাম্মাদ দেরাওয়ারদি' এবং 'লাইস ইবনে সাঈদ'।

আহলে সুন্নাতের রেজাল শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তিত্বদের (যারা হাদিস বর্ণনাকারী রাবী ও মুহাদ্দিসদের সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন) দৃষ্টিতে হাদীসে দ্বাহদ্বাহ'র রাবীদের অবস্থান :

ক. সুফিয়ান ইবনে সাঈদ সুরী

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে উসমান যাহাবী আহলে সুন্নাতের রেজাল শাস্ত্রের একজন প্রসিদ্ধ মনিষী। তিনি সুরী সম্পর্কে বলেছেনঃ "সুফিয়ান ইবনে সুরী জাল হাদিসগুলোকে দূর্বল রাবী থেকে বর্ণনা করত।"

উক্ত বাক্য থেকে স্পষ্ট যে, সুফিয়ান সুরীর বর্ণনাগুলো প্রতারণামূলক। আর দূর্বল রাবী এবং অপরিচিত ব্যক্তি থেকে হাদিস বর্ণনা করার কারণেই তার বর্ণনা করা সব রেওয়ায়েতই মূল্যহীন।

খ. আব্দুল মালেক ইবনে উমাইর

যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন, "অতি বৃদ্ধ হওয়াতে তার স্মৃতিশক্তি কমে গিয়েছিল।"

আবু হাতেম বলেন, "স্মৃতি-বিভ্রাটের কারণে হাদিস সংরক্ষণের শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল এবং তার মুখস্থ শক্তিও লোপ পেয়েছিল"।

আহমাদ ইবনে হাম্বাল বলেন, "আব্দুল মালেক ইবনে উমাইর হলো দূর্বল দূর্বল (রাবীদের অন্যতম) এবং বহু ভুল করত (অর্থাৎ ভিত্তিহীন ও জাল রেওয়ায়েত বর্ণনা করত)"।

ইবনে মুঈন বলেন, "সে সঠিক এবং ভুল হাদীসের মিশ্রণ ঘটাত।"

ইবনে খারাশ বলেন, "শো'বাহও তার ওপর সন্তুষ্ট ছিল না"।

কুসাজ, আহমাদ ইবনে হাম্বাল থেকে বর্ণনা করেন, আব্দুল মালেক ইবনে উমাইরকে (রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী) অত্যন্ত দূর্বল ও যয়ীফ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।"

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, আব্দুল মালেক ইবনে উমাইর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী:

১. দূর্বল স্মৃতিশক্তি ও ভোলা মনের অধিকারী।

২. দূর্বল (রেজালশাস্ত্রের দৃষ্টিতে) অর্থাৎ যে ব্যক্তির রেওয়ায়েতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

৩. (তার রেওয়ায়েত) ভুলে পরিপূর্ণ।

৪. মিশ্রণকারী (যে ব্যক্তি সঠিক রেওয়ায়েতের সঙ্গে মিথ্যা রেওয়ায়েতের মিশ্রণ ঘটায়)।

এটা স্পষ্ট, যে সব বৈশিষ্ট্য আব্দুল মালেক ইবনে উমাইর সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটি তার হাদিসগুলোর ভিত্তিহীনতা প্রমাণে যথেষ্ট। আর ওই সব ত্রুটি সম্মিলিতভাবে তারই মাঝে বিদ্যমান ছিল।

গ. আব্দুল আযিয ইবনে মুহাম্মাদ দুরাওয়ারদিঃ

রেজাল শাস্ত্রে আহলে সুন্নাতের পণ্ডিতরা তাকে দূর্বল স্মৃতিশক্তি ও ভোলা মনের অধিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন, "দুরাওয়ারদি'র স্মৃতিশক্তি এত দূর্বল যে তার রেওয়ায়েতের ওপর নির্ভর করা যায় না বা সেসবের সহায়তায় কোন যুক্তি প্রদর্শন করা সম্ভব নয়"।

আহমাদ ইবনে হাম্বাল 'দুরাওয়ারদি' সম্পর্কে বলেন, "যখনই সে তার স্মৃতিশক্তির সহায়তায় কোন রেওয়ায়েত বর্ণনা করত তখন তা অসংলগ্ন, অপ্রাসঙ্গিক ও বাতিল বা ভিত্তিহীন মনে হতো।"

আবু হাতেম তার সম্পর্কে বলেন, "তার কথার ওপর নির্ভর করা যায় না বা তার কথার স্বপক্ষে কোনরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা সম্ভব নয়।"

ঘ. লাইস ইবনে সাঈদ :

আহলে সুন্নাতের রেজাল শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী অধ্যয়নে এই বিষয়টি স্পষ্ট অনুধাবনীয় যে, লাইস যে সব রাবীর নিকট হইতে হাদীস সংগ্রহ করতেন তারা সবাই অপরিচিত ও দূর্বল তথা যয়ীফ এবং তাদের বর্ণিত হাদীসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

আর লাইস ইবনে সাঈদও তাদের অন্যতম যয়ীফ ও বেপরোয়া এবং অমনোযোগী রাবী (বর্ণনাকারী) হাদিস শোনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অসাবধান (অর্থাৎ কি শুনতে হবে ও কি বর্ণনা করতে হবে সে বিষয়ে তিনি সুস্থির ছিলেন না)। আর যারা তার থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছে তারাও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন।

ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন তার সম্পর্কে বলেন, "লাইস ইবনে সাঈদ যাদের কাছ থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছে (তাদের চেনার ক্ষেত্রে) এবং হাদিস শোনার ক্ষেত্রে অসাবধান ছিল, অর্থাৎ কার কাছ থেকে এবং কোন বিষয়ের বা কোন ধরনের হাদিস বর্ণনা করতে হবে সে ব্যাপারে তিনি সাবধান ছিলেন না।"

'নাবাতী' তাকে দূর্বলদের অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজ গ্রন্থ 'আত্ তাযলীল আলাল কামেল'-এ তার (লাইস ইবনে সাঈদ) নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি এ বইটি শুধু দূর্বল রাবীদের পরিচয় তুলে ধরার জন্যই লিখেছেন ।

এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট হয় যে, 'হাদীসে দ্বাহদ্বাহ'-এর প্রধান বা মূল রাবীরাই ছিলেন যয়ীফ তথা দূর্বল। আর এ কারণেই তাদের হাদিসে বিশ্বাস করা যায় না।

হাদীসে দ্বাহ্দ্বাহ্ কোরআন ও সুন্নাতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় :

উল্লিখিত হাদিসটিকে রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে এভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যে, তিনি হযরত আবু তালিবকে দোযখের বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড বা ব্যাপক আগুনের স্তর থেকে বের করে কম আগুনের একটি গর্তে স্থানান্তরিত করলেন। আর এভাবে তার আযাবে হ্রাস ঘটানো হলো। অথবা কেয়ামতের দিন তাকে শাফায়াত করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। অথচ পবিত্র কোরআন ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত একমাত্র মু'মিন ও মোত্তাকী মুসলমানদের জন্যই শাস্তি হ্রাস ও শাফায়াতের বিষয়টিকে সমর্থন করে। অতএব, যদি আবু তালিব 'কাফের' হয়ে থাকে তবে আল্লাহর রাসূল (সা.) কখনই তার আযাব কমাতে অথবা তাকে 'শাফায়াত' করতে সক্ষম নন। কারণ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীকে কাফেরদের বিষয়ে কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, শাফায়াত নয়।

এভাবেই 'হাদিসে দ্বাহদ্বাহ'-এর বক্তব্য বা বিষয়বস্তুর ভিত্তিহীনতা ও যারা হযরত আবু তালিবকে কাফের জ্ঞান করেন তাদের দাবির অসারতা প্রমাণিত হয়। তাছাড়া উক্ত হাদীসের সহীত পবিত্র কোরআনের কোন সম্পৃক্ততা নেই, উপরন্ত সাংঘর্ষিক। যেমন মহান আল্লাহপাক এমন নন যে, কারো সৎ কাজের বিনিময়ে তাঁকে জাহান্নামে প্রেরন করবেন। হযরত আবু তালিব নবী (সা.)-এর লালন-পালন ও হেফাজত করে ইসলামের মূল ভীত রচনায়, সৎকাজের যে অপরিশোধিত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তার বিনিময়ে এ পুরস্কার দ্বাহদ্বাহ? (নাউজুবিল্লাহ) পাঠক বিবেচনা করুন।

বনী উমাইয়া শাসকদের দরবারে রচিত হাদীসের আলোকে মুসলমান আজ নানা মত ও পথে দ্বিধা বিভক্ত। যে কারনে দ্বীন ইসলামের পৃষ্ঠপোষক হযরত আবু তালেবকে কাফের আখ্যা দিতে ঐ সকল মুসলমানের আকল জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনার কোনো উন্মেষ ঘটেনি। নিম্নে আমি মহানবী (সা.)-এর দুজন বিখ্যাত সহাবীর উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন হযরত আবু তালিব ইন্তেকালের সময় পাঠ করেছেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই, মোহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।[৩৯]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আবু তালিব ইন্তেকালের পূর্বে বলেছেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মহাম্মাদুর রাসূল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই, মোহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।"[৪০]

---

[৩৯] শারাহে নাহজ আল বালাঘা, ইবনে আবিল হাদিদ, খণ্ড-৩, পৃ-৩১২; আল-গাদির, খণ্ড-৭, পৃ-৩৭০।

প্রকৃত সত্য উদঘাটনে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা

হাদীসে কুদ্সীর মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি মহান আল্লাহ পাক তাঁর নিজ পরিচয় প্রকাশের নিমিত্তে সর্ব প্রথম 'নূর-এ-মোহাম্মদ'-কে সৃষ্টি করেছেন। অপর আরেকটি হাদীসে নবী (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।"[৪১]

উল্লিখিত হাদীস দুটিতে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট তা হচ্ছে মহান সৃষ্টিকর্তার অনন্ত বিশালতা সম্পর্কে অবগত হওয়া, সর্বজ্ঞানের নগরী নবী মোহম্মদ (সা.) ব্যতীত যেমন আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তদ্রুপ মহানবী (সা.)-এর শান ও মান বোঝার যোগ্যতা এক আল্লাহ ব্যতীত মানুষ তো দূরের কথা অনেক নবী (সা.)-এর পক্ষেও সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, আরেকটি হাদীসে নবী (সা.) বলেছেন, "হে আলী আমাকে কেউ চিনতে/বুঝতে পারেনি তুমি এবং আল্লাহ ব্যতীত। তোমাকে কেউ বুঝতে পারেনি আমি এবং আল্লাহ ব্যতীত। আর আল্লাহকে কেউ বুঝতে পারেনি আমি এবং তুমি ব্যতীত"।[৪২]

উল্লিখিত হাদীসটি জানার পর আমি একটু চিন্তিত হয়ে পড়ি। হযরত আলীর নবী (সা.)-এর সমজ্ঞান আছে কি? অতঃপর যখন নিম্নোক্ত হাদীস দু'টি জানতে পারলাম তখন আমার ঐ ভুল ধারণাটি দূর হলো।

নবী (সা.) বলেছেন, "আমি এবং আলী একই নূরের দুটি টুকরো"। "আমি হচ্ছি জ্ঞানের শহর আর আলী হচ্ছে তার দরজা।"[৪৩]

আমি পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি প্রকৃত সত্য উদঘাটনে আমাদেরকে কোরআন হাদীস ও সেই সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনার আলোকে যাচাই বাছাই করতে হবে। এখন আমি একটি বহুল প্রচারিত হাদীসের বর্ণনা করছি। হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত : "রাসূল (সা.) বলেছেন বনী ইস্রাইলীরা ৭২ ফেরকায় (দলে) বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ ফেরকায়

---

[৪০] আল-গাদিও, খণ্ড-৭, পৃ-৩৯৯; সিরাতুন নবী, মাওঃ শিবলি নোমানী, খণ্ড-১, পৃ২১৯-২২০।

[৪১] বিহারুল আনওয়ার, পৃ-১৯

[৪২] মানাকেব মুর্তাজাওরী, পৃ-৫।

[৪৩] মানাকেব মুর্তাজাওরী, পৃ-৬০; মুসনদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবে আরবায়ীন।

তন্মধ্যে মাত্র একটি ফেরকা হবে নাজাতপ্রাপ্ত ও জান্নাতী। তাছাড়া সবগুলো ফেরকা হবে জাহান্নামী।"[৪৪]

উল্লিখিত হাদীসের আলোকে পাঠকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করছি :

- আমরা কি কখনও নিজেদের যাচাই করে দেখেছি, আমার অবস্থান বাহাত্তরে না একে?
- যাচাইয়ের পথতো সর্বদা উন্মুক্ত এখন শুধু আমাদের ইচ্ছা প্রকাশের প্রয়োজন। যেমন আমরা কি কোরানের আদেশ-নিষেধ মেনে চলি?
- আমরা কি সে সকল হাদীস অনুসরণ করি যার সাথে কোরআনের সম্পৃক্ততা রয়েছে?
- আমরা কি হারাম হালাল বিবেচনা করি?
- আমরা কি সুদ-ঘুষ থেকে নিজেকে রক্ষা করি?
- আমরা কি অপরাধ দুর্নীতি থেকে দূরে থাকি?
- আমরা কি ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করি?
- আমারা কি আইনের শাসন ও অপরাধী দমনে সক্রিয়?
- আমরা কি সত্য প্রকাশের ভূমিকা ও মিথ্যা প্রচারে বাধা দেয়ার চেষ্টা করি?
- আমরা কি সত্য ও মিথ্যা এক করে দিই?
- আমরা কি সত্যকে গোপন করি?
- আমরা কি অঙ্গীকার কিংবা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি?
- আমরা কি ন্যায় বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়?
- আমরা কি স্বজনপ্রীতি আর সুযোগসন্ধানী থেকে মুক্ত?
- আমরা কি নিজ ত্রুটি সংশোধন না করে অন্যের ত্রুটি প্রচার থেকে সরে আসতে পেরেছি?
- আমাদের কথা এবং কাজে মিল আছে কি?
- আমরা কি নিঃস্বার্থভাবে মানবতার কল্যাণে কিছু করতে পেরেছি?
- আমরা কি নিজেকে ছাড়া দেশ ও দশের কথা ভাবি কখনো?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর মহান আল্লাহ পাক তাঁর নবী (সা.)-এর মাধ্যমে সেই ১৪শ বছর পূর্বেই পবিত্র কোরআনে প্রকাশ করেছেন। অথচ এর মর্মবাণী অধিকাংশ মানুষ উপলব্ধি করেননি। আর ভুলে গেছেন আল্লাহর মনোনীত মহান

---

[৪৪] মানাকেব মুর্তাজাওরী, পৃ-৬০; মুসনদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবে আরবায়ীন।

ইমামদের। যে কারণে আমাদের সমাজ দেশ তথা সারা বিশ্বে অশান্তি, নৈরাজ্য, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, সুদ-ঘুষের অবাধ প্রচলন, নিয়ন্ত্রণহীন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, শাসনের নামে শোষণের উপস্থিতি, ব্যবসার নামে প্রতারণা, আমানতের খেয়ানত ও জালিয়াতির নব নব কৌশল আবিষ্কার, মানবতার মূল্যবোধের অবক্ষয়, শিষ্টাচার হীনতা, বেলাল্লাপনার প্রচার ও প্রসার সহ নানাবিধ অনৈতিক অবক্ষয়ে আমরা জর্জরিত।

যদি ধর্ম কিংবা নীতি বলতে আমাদের মধ্যে কিছু থেকে থাকে তবে কেন এত বিপর্যয়? সত্যি কথা বলতে কি আমাদের মধ্যে ধর্মের শুধু নামটাই বিদ্যমান আছে। এর অন্ত:র্নিহীত কার্যক্রম অর্থাৎ সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, পাপ কর্মের ভয় ও খোদাভীরুতা বহু পূর্বেই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। এর প্রমাণ মেলে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে। যেমন, দিনের শুরু থেকে রাতের আঁধারের আগমণ পর্যন্ত যদি শুধু এইটুকু সময় আমারা নিজেরা নিজেদের কর্মকাণ্ড খাতায় লিপিবদ্ধ করি, তবে দেখতে পাব আমি প্রতিদিন কত মিথ্যা কর্মে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আর এদিক থেকে আমরা বরাবরই দুর্ভাগা। রমজানের আগমণের পূর্বেই আমাদের ব্যবসায়ীগণ দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে দেন তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী। যদিও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ আমাদের অনুরূপ নয়। দুখঃজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ যেন মামুলি ব্যপার। অথচ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তা বিরল। গানে কিংবা কবিতায় আমরা নিজেদের যেভাবে তুলে ধরি বাস্তবে যদি তাই হোতো, তবে কতই না সুন্দর হোতো। বাস্তবতা এটাই। আমাদের এমন কোন সেক্টর নেই যেখানে অপরাধ-দুর্নীতির মতো কোনো না কোন জটিল সমস্যা নেই। আর সমস্যা তো মানুষেরই সৃষ্ট। কবে আমরা এমন সব সমস্যা হতে মুক্ত হবো তা কেবল আল্লাহ পাকই জানেন।

পবিত্র কোরআনে নামাজের বিষয়ে বেশ কয়েকবার তাগিদ দেয়া হয়েছে। তাই আমাদের সকলেরই নামাজে মনোযোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তবে যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে, যদি আমরা নামাজী হয়ে যাই তাহলে আমাদের উচিৎ এতিম, মিসকীনদের সাহায্য করা এবং লোক দেখানো নামাজ না পড়া। আর অবশ্যই মন্দ কথা কিংবা মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা। কিন্তু বাস্তবতা হলো আমরা অনেকেই দু'টাই সমান্তরালে করে যাচ্ছি। যার প্রমাণ পাওয়া যায় ঐসকল নামাজী যখন নামাজ শেষে হাট-বাজারে কিংবা তাদের কর্মস্থলে এসে নিত্য কর্মে যোগ দেন, তাদের তখনকার আচার-আচরণ থেকেই তা প্রকাশিত হয়। আর অনূরূপ নামাজীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক পূর্ব থেকেই অবগত।

তাই তিনি সূরা মাউনের ৪-৬ নং আয়াতে তাদের প্রতি ধিক্কার জানিয়েছেন এভাবে :

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ

ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ

ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ

"ধিক সেই সব নামাজীর প্রতি, যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে বে-খবর। যা তারা লোক দেখানোর জন্য করে"।

তাই আমাদের সকলের নামাজ ও কর্ম সেরূপ হওয়া বাঞ্ছণীয় যেন আমরা হতে পারি আল্লাহর করুণা প্রত্যাশী, ধিক্কারের অধিকারী নয়।

মুসলমানদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে পবিত্র কোরানে আল্লাহ পাক যে সকল আয়াত নাজিল করেছেন তার কিছু অংশ পাঠকদের খেদমতে উপস্থাপন করছি :

১) এটি সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই। পরহেজগারদের জন্য রয়েছে পথ প্রদর্শন; যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে এবং তাদেরকে যে রুযী দান করা হয়েছে তা থেকে ব্যয় করে এবং আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যারা বিশ্বাস করে ও পরকালে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী। তারাই নিজেরদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, তাঁরাই সফলকাম। (সূরা-২: আয়াত- ৫)

২) তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিয়ো না এবং জেনে শুনে সত্যকে গোপন করো না। আর নামাজ কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়। (২ : ৪২-৪৩)

৩) সাহায্য প্রার্থনা করো ধৈর্যের সাথে নামাজের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন কিন্তু সেই সমস্ত বিনয়ী লোকগণ ব্যতীত, যারা এ কথা বিশ্বাস করে যে, তাদেরকে উপস্থিত হতে হবে স্বীয় পালনকর্তার সামনে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। (২ : ৪৫-৪৬)

৪) তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে এক নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব। (৫ : ১৫)

৫) তোমাদের অভিভাবক হচ্ছেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং সেই সব ঈমানদার ব্যক্তি যারা নামাজ কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে রুকু অবস্থায়। (৫ : ৫৫)

৬) হে রাসূল পৌঁছিয়ে দিন, আপনার রবের পক্ষ থেকে যা আপনাকে বলা হয়েছে। যদি আপনি তা না পৌঁছান, তবে আপনার রেসালাতের কাজ পরিপূর্ণ হলো না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চই আল্লাহ কাফেরদেরকে হেদায়েত প্রদান করেন না। (৫ : ৬৭)

৭) আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম, আমার নিয়ামত দ্বারা এবং ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (৫ : ৩)

৮) নামাজের ধারে কাছেও যেয়ো না নেশাগ্রস্ত অবস্থায়। (৪ : ৪৩)

৯) হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন। হে ঈমানদারগণ তোমরা নবী (সা.)-এর কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ আচরণ করো। তাঁর সাথে সেরূপ আচরণ করো না। এতে তোমাদের আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমরা টের পাবে না। (৪৯ : ১-২)

১০) সৎ কাজে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে এগিয়ে যাও। তোমরা যেখানেই থাকবে, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাশীল। (২ : ১৪৮)

১১) সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না। হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্যের সাথে নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, জান ও মালের ক্ষয়ক্ষতি ও ফল-ফসলের বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। (২ : ১৫২-১৫৫)

১২) হে ঈমানদারগণ তোমরা পবিত্র বস্তু সামগ্রী আহার করো। যেগুলি আমি তোমাদের রুজী হিসেবে দান করেছি এবং শূকরিয়া আদায় করো আল্লাহর, যদি তোমরা তারই বন্দেগি করো। তিনি তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যেসব জীবজন্তু আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক নিরুপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমান ও সীমালজ্ঞনকারী নয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। (২ : ১৭২-১৭৩)

১৩) সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, কেয়ামত দিবসের ওপর, ফেরেস্তাদের ওপর, সকল কিতাবের ওপর এবং সমস্ত নবী রাসূলগণের ওপর। আর সম্পদ ব্যয় করবে আল্লাহর মহব্বতে। সাহায্য করবে আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকীন, মুসাফির, ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী কৃতদাসদের। আর যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা সম্পাদন

করে এবং অভাবে রোগে শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী তারাই হলো সত্য আশ্রয়ী এবং তারাই পরহেজগার। (২ : ১৭৭)।

১৪) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর। যেন তোমরা পরহেজগারী অর্জন করতে পার। (২ : ১৮৩)

১৫) আর পানাহার করো যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোজা পূর্ণ করো রাত পর্যন্ত। (২ : ১৮৭)

১৬) আর লড়াই করো আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (২ : ১৯০)

১৭) আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায়, তাহলে কারো প্রতি কোনো জবরদস্তি নেই। কিন্তু যারা জালেম তাদের বিষয় আলাদা। (২ : ১৯৩)

১৮) আর ব্যয় করো আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করে নয়। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করো। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালবাসেন। (২ : ১৯৫)

১৯) পার্থিব জীবন কাফেরদের জন্য সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। তারা ঈমানদারদের লক্ষ্য করে উপহাস করে। পক্ষান্তরে, যারা পরহেযগার তারা সেই কাফেরদের তুলনায় কেয়ামতের দিন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় অবস্থান করবে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সীমাহীন রুজি দান করেন। (২ : ২১২)

২০) তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে কি তারা ব্যয় করবে? বলে দিন যা তোমরা ব্যয় করবে তা হবে পিতা-মাতার জন্য নিকট আত্মীয়ের জন্য, এতিম, অসহায়ের জন্য ও মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যেকোনো সৎ কাজ করবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা ভালভাবে অবগত আছেন। (২ : ২১৫)

২১) যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান খয়রাত করো, তবে তা উত্তম। আর যদি গোপনে অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম। এতে আল্লাহ তোমাদের কিছু গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্মের বিষয়ে সম্যক অবগত। (২ : ২৭১)

২২) যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (৩ : ৮৫)

২৩) তোমরা কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না করো। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা জানেন। (৩ : ৯২)।

২৪) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেভাবে ভয় করা উচিত, ঠিক তেমনি ভাবে ভয় করো অবশ্যই তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (৩ : ১০২)

২৫) আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ় হস্তে ধারণ করো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন। তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পরে ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার। (৩ : ১০৩)

২৬) যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে কেউ তোমাদের পরাস্ত করতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহর ওপরই মুসলমানদের ভরসা করা উচিত। (৩ : ১৬০)

২৭) প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। কিয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের কর্মের পরিপূর্ণ ফলপ্রাপ্ত হবে। অতঃপর যাকে দোযখের আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। (৩ : ১৮৫)

২৮) নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমা করেন না, তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন এছাড়া অন্যান্য অপরাধ, যার জন্য ইচ্ছা। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করে আল্লাহর সাথে, সে তো এক মহাপাপে লিপ্ত হলো। (৪ : ৪৮)

২৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের এবং উলিল আমরগণের। অতঃপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হও,

তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তণ করো। যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক থেকে উত্তম। (৪ : ৫৯)

৩০) যে আল্লাহর নির্দেশে মস্তক অবনত করে সৎ কাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইব্রাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ। তাঁর চেয়ে উত্তম ধর্ম কার হতে পারে? আল্লাহ ইব্রাহিমকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছেন। (৪ : ১২৫)

৩১) হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিয়ো না, মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজেদের ওপর আল্লাহর প্রকাশ্য দলিল কায়েম করবে? (৪ : ১৪৪)

৩২) হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ করো এবং তাঁর পথে জিহাদ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (৫ : ৩৫)

৩৩) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য নিষেধ করা হলো মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ধারক তীরসমূহ এই সবকিছু শয়তানের অপবিত্র কাজ ব্যতিত অন্য কিছু নয়। অতএব এগুলি থেকে বেঁচে থাকো যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও। (৫ : ৯০)

৩৪) পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত আর কিছুই নয়। পরকালের আভাস পরহেযগারদের জন্য শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি বোঝো না? (৬ : ৩২)

৩৫) তোমরা তাদের মন্দ বলো না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহ ব্যতীত। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কৃতকর্মকে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতঃপর তাদেরকে স্বীয় পালনকর্তার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদের বলে দেবেন যা কিছু তারা করত। (৬ : ১০৮)

৩৬) তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একে অন্যের ওপর মর্যাদায় সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন। আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতাও বটে এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৬ : ১৬৫)

৩৭) তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সঙ্গোপনে। তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (৭ : ৫৫)

৩৮) আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোলো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ্য জাহিলদের থেকে দূরে থাকো। (৭ : ১৯৯)

৩৯) আর যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তোমরা তা মনযোগ দিয়ে শোন এবং নীরব থাক, যাতে তোমাদের ওপর রহমত হয়। (৭ : ২০৪)

৪০) হে ঈমাদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবক রূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের চেয়ে কুফরীকে অধিক ভালবাসে। আর তোমরা যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। (৯ : ২৩)

৪১) যে কেউ শুধু পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, আমি দুনিয়াতেই তাদের কর্মফল পূর্ণরূপে দান করি। যাতে তাদের কিছু মাত্র কমতি না হয়। এরাই হল সেই সব লোক যাদের আখেরাতের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছু নেই। তারা যা কিছু উপার্জন করেছে সবই বরবাদ ও বিনষ্ট হয়ে গেছে। (১১ : ১৫-১৬)

৪২) আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মোমেনদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে, অতঃপর মরে ও মারে। তাওরাত ইঞ্জিল ও কোরআনে এ সত্য প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আর আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী কে হতে পারে? সুতরাং আনন্দিত হও সে লেনদেনের ওপর, যা তোমরা করেছ তাঁর সাথে। আর এ হচ্ছে মহাসাফল্য। তারাই তওবাকারী, ইবাদতকারী, শোকরগুজারকারী, দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক চ্ছেদকারী, রুকু ও সেজদা আদায়কারী, সৎ কাজে আদেশদানকারী ও মন্দ কাজে নিবৃতকারী এবং আল্লাহর দেয়া সীমাসমূহের হেফাজতকারী। বস্তুত সুসংবাদ দাও সেই সব মুমিনদের। (৯ : ১১১-১১২)

৪৩) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে শান্তি লাভ করে, জেনে রাখো, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে। (১৩ : ২৮)

৪৪) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে অবগত। নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না। (১৬ : ২৩)

৪৫) আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চই এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। (১৭ : ৩২)

৪৬) আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরিকদের পাবেন এবং মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বের অধিক নিকবর্তী

তাদের পাবেন, যারা নিজেদের খ্রীষ্টান বলে। এর কারণ এই যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে আলেম ও দরবেশ রয়েছে যারা অহংকার করে না। (৫ : ৮২)

৪৭) নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেস্তাগণ নবী (সা.)-এর ওপর দরুদ পাঠ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবী (সা.)-এর ওপর দরুদ পাঠ কর বিনয়ের সাথে। (৫ : ৫৬)

৪৮) নামাজ কায়েম করুন সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত, আর ফজরে কোরআন পাঠ করুন। নিশ্চই ফজরে কোরাআন পাঠ মুখোমুখি হয়। (১৭ : ৭৮)

৪৯) তদুপরি যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তারা তোমাদের মতো হবে না। (৪৭ : ৩৮)

৫০) আপনি কেবল তাদের সতর্ক করুন, যারা তাদের পালন কর্তাকে না দেখে ভয় করে এবং নামাজ কায়েম করে। (৩৫ : ১৮)

হাদীসে রাসূল (সা.)

১) হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনি কখন নবুয়্যত লাভ করেছেন? তিনি (সা.) বলেন, যখন আদম মাটি ও পানির মাঝে ছিলেন। অর্থাৎ যখন আদমের অস্তিত্ব ছিল না। [তাফসীরে নুরুল কোরআন, খণ্ড-৩, পৃ-৩০৫; নুরে নবী, –মাওলানা আমিনুল ইসলাম, খণ্ড-১, পৃ-৫; সহীহ তিরমিযি, (ই, সেন্টার), খণ্ড-৬, হাদীস-৩৫৪৮]

২) মহানবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যাকে ভালোবাসবে এবং অনুসরণ করবে, আখেরাতে তার ঐ ব্যক্তির সাথে হাশর হবে।" [সহীহ মুসলিম, (ই, ফা.), খণ্ড-৭, হাদীস-৬৪৭০]

৩) রাসূল (সা.) বলেছেন, "শেষ বিচার দিবসে আমার শাফায়াত হবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে তাদের জন্য, যারা আমার আহলে বাইতকে অনুসরণ করে ও ভালোবাসে।" [তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃ-১৪৬; কানযুল উন্মাল, খণ্ড-৬, পৃ-২১৭]

৪) মহানবী (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুমিনের হৃদয়ের ইমাম হোসাইন-এর শাহাদাতের বিষয়ে এমন ভালোবাসার উত্তাপ রয়েছে যা কখনো শীতল হওয়ার নয়।" [মুস্তাদারক আল ওয়াসাইল, খণ্ড-১০, পৃ-৩১৮]

৫) মহানবী (সা.) বলেছেন, "সমস্ত চোখ কিয়ামতের দিন কাঁদতে থাকবে, নিশ্চয়ই কেবল সেই চোখ ছাড়া, যা ইমাম হুসাইনের বিয়োগান্ত ঘটনায় কেঁদেছে, ঐ চোখ সেই দিন হাসতে থাকবে এবং তাকে জান্নাতের নিয়ামতসমূহের সুসংবাদ প্রদান করা হবে।" [বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড-৪৪, পৃ-১৯৩]

৬) মহানবী (সা.) হযরত ফাতেমাকে বলেন যে, "কিয়ামতের দিন তুমি নারীদের জন্য শাফায়াত করবে এবং আমি পুরুষদের জন্য শাফায়াত করবো; যারা ইমাম হুসাইনের দুঃখে ক্রন্দনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমরা হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।" [বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড-৯৪, পৃ-১৯২]

৭) মহানবী (সা.) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন এক দল লোককে অত্যন্ত চমৎকার ও সম্মানিত অবস্থায় দেখা যাবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তারা ফেরেস্তা বা নবী কিনা? উত্তরে তারা বলবেন, আমরা ফেরেস্তাও নই নবীও নই, বরং মোহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের মধ্যে অভাবী লোক। তখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তাহলে কিভাবে তোমরা এত উচ্চ মর্যাদা লাভ

করলে? উত্তরে তাঁরা বলবে, আমরা খুব বেশি আমল করিনি এমনকি পুরো বছর রোজা রাখিনি এবং পুরো রাত্রি ইবাদতেও কাটাইনি। তবে আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কায়েম করতাম এবং মোহাম্মদ (সা.) ও তাঁর আহলে বাইতের সদস্যগণের নাম শুনলে তাঁদের উপর দূরুদ পাঠ করতাম। আর তাঁদের দুঃখের কথা শুনলে আমাদের গালগড়িয়ে অশ্রু প্রবাহিত হত।" [মুসতাদারক আল ওয়াসাইন, খণ্ড-১০, পৃ-৩১৮]

৮) মহানবী (সা.) হযরত আলীর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, "জেনে রেখ, সে তোমাদের মাঝে আমার ভাই, আমার উত্তরসূরি এবং আমার স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং আনুগত্য করবে।" [তারীখে তাবারী, খণ্ড-২, পৃ-২২১৭]

৯) মহানবী (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয়ই আলী আমার পরে তোমাদের অভিভাবক।" [কানযুল উম্মল, খণ্ড-১১, পৃ-৬১২; আল ফেরদৌস, খণ্ড-৫, পৃ-২৯২, হাদীস-৮৫২৮]

১০ মহানবী (সা.) হযরত আলীর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, "হে আলী আমি হলাম সাবধানকারী আর তোমার মাধ্যমে অন্বেষণকারীরা পথ খুজে পাবে।" [তাফসীরের তাবারী, খণ্ড-১৩, পৃ-৭২; ইমাম আলী (আ.); অনুবাদ-ইবনে আসাকিব, খণ্ড-২, পৃ-৪১৭]

১১) রাসূল (সা.) হযরত আলীর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, "হে আলী আমার পরে তুমি প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী।" [আল মুস্তাদারক হাকেম, খণ্ড-৩, পৃ-১৩৪]

১২) মহানবী (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয়ই আলী আমা থেকে আর আমি আলী থেকে। সে আমার পরে সকল মুমিনদের নেতা।" [মুসনাদে আহামাদ, খণ্ড-৪, পৃ-৪৩৮]

১৩) রাসূল (সা.) হযরত আলীকে ইঙ্গিত করে বলেন, "তুমি আমার পন্থায় জীবন-যাপন করবে, আর আমার আদর্শের পথেই শাহাদাত বরন করবে।" [আল মুস্তাদারক হাকেম, খণ্ড-৩, পৃ-১৪২]

১৪) রাসূল (সা.) বলেছেন, "হে আলী তুমি আমার নিকট মুসার ভাই হারুনের ন্যায়। শুধু আমার পরে আর কোনো নবী নেই।" [সুনানে তিরমিযি, খণ্ড-৫, পৃ-৬৪১, হাদীস-৩৭৩০; সহীহ মুসলিম, খণ্ড-৪, পৃ-৪৪]

১৫) মহানবী (সা.) বলেছেন, "আলী কোরআনের সাথে আর কোরআন আলীর সাথে।" [আল মুস্তাদারক হাকিম, খণ্ড-৩, পৃ-১২৪]

১৬) মহানবী (সা.) বলেছেন, "আলী এবং তার অনুসারীরা নিঃসন্দেহে কেয়ামতের দিন বিজয়ী।" [আল ফেরদৌস, খণ্ড-৩, পৃ-৬১, হাদীস-৪১৭২]

১৭) মহানবী (সা.) বলেছেন, "মুনাফিকরা কখনো আলীকে ভালোবাসবে না, আর মুমিনরা কখনো তাঁকে ঘৃণা করবে না।" [সুনানী তিরমিযি, খণ্ড-৫, পৃ-৬৩৫, হাদীস-৩৭১৭]

১৮) মহানবী (সা.) বলেছেন, "আলী আমার থেকে আমি আলী থেকে, আমি এবং আলী ব্যতীত কেহই রেসালাতের অধিকার পূরন করেনি।" [সুনানী তিরমিযি, খণ্ড-৫, পৃ-৬৩৬, হা-৩৭১৯; মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড-৪, পৃ-১৬৪]

১৯) মহানবী (সা.) বলেছেন, "আলী ঈমানে সর্বাপেক্ষা দৃঢ়পদ, উম্মতের মধ্যে হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী এবং মুমিনদের অভিভাবক।" [কানযুল উম্মাল, খণ্ড-১১, পৃ-৬১৬]

২০) মহানবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আলীকে গালমন্দ করে, সে যেন আমাকে গালি দিল।" [আল মুস্তাদারক হাকেম, খণ্ড-৩, পৃ-১২১]

২১) মহানবী (সা.) বলেছেন, "এমন কোনো নবী নেই যার উম্মতের মধ্যে তাঁর দৃষ্টান্ত কেউ ছিল না। আর আমার দৃষ্টান্ত হলো আলী ইবনে আবু তালিব।" [আর রিয়াদুন নাদ্রাহ, খণ্ড-৩, পৃ-১২০]

২২) মহানবী (সা.) বলেছেন, "আলী সত্যের সাথে আর সত্য আলীর সাথে, এ দুটো কখনো একে অপর থেকে বিছিন্ন হবে না, যতক্ষণ না আমার সাথে হাউজে কাওসারে মিলিত হবে।" [তারীখে বাগদাদ, খণ্ড-১৪, পৃ-৩২১; ইমাম আলী, –ইবনে আসাকির, খণ্ড-৩, পৃ-১৫৩]

২৩) মহানবী (সা.) হযরত ফাতেমা যাহরাকে বলেছেন, "তোমাকে আমার পরিবারের সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছি। সে জ্ঞান-বিদ্যায়, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা ও ইসলাম গ্রহণে সবাইকে পিছে ফেলে এগিয়ে আছে।" [কানযুল উম্মাল, খণ্ড-১১, পৃ-৬০৫]

২৪) মহানবী (সা.) বলেছেন, "হে আম্মার, যদি দেখতে পাও যে আলী এক পথে চলছে আর লোকেরা অন্যপথে, তাহলে তুমি আলীর পথে চলবে এবং লোকদের ত্যাগ করবে। কারণ আলী কখনো তোমাকে বক্রপথে পরিচালিত করবে না এবং হেদায়েতের পথ থেকে বাহিরে নিয়ে যাবে না।" [তারীখে বাগদাদ, খণ্ড-১৩, পৃ-১৮৭; কানযুল উম্মাল, খণ্ড-১১, পৃ-৬১৩]

রাসূল (সা.)-এর 'জ্ঞান নগরীর দরজা' হযরত আলীর বিখ্যাত উক্তি সমূহ যা 'নাহ্‌জ আল বালাঘা' নামক গ্রন্থে শেখ ফখরুদ্দিন রাজি সংকলিত করেছেন (অনুবাদকঃ জেহাদুল ইসলাম)। যা বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও কল্যাণে তিনি যে সকল উক্তি উপদেশ ও প্রবাদ বলে গেছেন তার কিছু অংশ সুহৃদ পাঠক-পাঠিকার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করছি :

১) যে লোভে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে সে নিজেকে অবমূল্যায়ন করে; যে নিজের অভাব অনটনের কথা প্রকাশ করে, সে নিজেকে অবনমিত করে; আর যার জিহ্বা আত্মাকে পরাভূত করে তার আত্মা দূষিত হয়ে পড়ে।

২) কৃপণতা লজ্জা, কাপুরুষতা ত্রুটি, দারিদ্রতা একজন বুদ্ধিমান লোককেও নিজের যুক্তি প্রদর্শনে ব্যর্থ করে দেয় এবং দুস্থ ব্যক্তি তার নিজ শহরেও আগন্তুকের মত।

৩) অযোগ্যতা হচ্ছে বজ্রাঘাত, ধৈর্য মানে সাহসিকতা, মিথ্যাচার হচ্ছে ধন-সম্পদের ন্যায়, আত্ম প্রত্যয় হচ্ছে বর্ম যেমন। আর সর্বোত্তম সাথি হচ্ছে আল্লাহর করুণাপ্রাপ্তি।

৪) মানুষের সাথে দেখা হলে এমন আচরণ করবে যেন তোমার মৃত্যুতে তারা কাঁদে এবং তুমি বেঁচে থাকলে তারা তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করে।

৫) প্রতিপক্ষের ওপর জয়ী হলে তাকে ক্ষমা করে দিও।

৬) সবচাইতে অসহায় সেই ব্যক্তি যার কোনো ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু নেই। আরো অসহায় সেই ব্যক্তি যে এরূপ বন্ধু হারায়।

৭) আপনজন যাকে পরিত্যাগ করে দূরবর্তীগণের সে প্রিয় হয়।

৮) ফেতনাবাজদের পুনপ্রমাণ করতে হয় না- একবারেই ধরা পড়ে। ন্যায় এর সাথে থাকতে না পারলেও অন্যায়ের সমর্থন করো না।

৯) যে ব্যক্তি লাগাম কষে না ধরে ঘোড়া দৌড়ায়, সে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়।

১০) যার কর্মতৎপরতা নিম্নমানের তার বংশ মর্যাদার জন্য তাকে উচ্চ মর্যদা দেয়া যায় না।

১১) যখন কোনো লোক তার হৃদয়ে কোনো কিছু গোপন করে তখন তার অনিচ্ছাকৃত কথা ও চেহারার ভাষায় তা প্রকাশ পায়।

১২) অসুস্থতার সময় যতোটুকু পার হাঁটাচলা করো।

১৩) কল্যাণকর কাজ যে করে সে কল্যাণ থেকে অধিকতর ভালো এবং পাপী পাপ থেকে নিকৃষ্ট।

১৪) উদার হয়ো কিন্তু অপচয়কারী হয়ো না, মিতব্যয়ী হয়ো কিন্তু কৃপণ হয়ো না।

১৫) যে আকাঙ্খাকে প্রসারিত করে সে তার আমলকে ধ্বংস করে।

১৬) আমীরুল মুমিনিন তাঁর পুত্র ইমাম হাসানকে বললেন, "হে পুত্র আমার নিকট থেকে চার চার আটটি বিষয় লিখে নাও। বুদ্ধিমত্তা সর্বোত্তম সম্পদ, মূর্খতা সবচেয়ে বড় দুরবস্থা, আত্ম গর্ব সবচেয়ে বড় বর্বরতা এবং নৈতিক চরিত্র গঠন সর্বোত্তম অবদান। হে আমার পুত্র! মূর্খ লোকের সাথে বন্ধুত্ব করো না। কারণ সে তোমার উপকার করতে গিয়ে ক্ষতি করে ফেলবে। কৃপণের সাথে বন্ধুত্ব করো না, কারণ যখন তুমি তার প্রয়োজন অনুভব করবে, তখন সে দৌড়ে পালাবে। পাপী লোকের সাথে বন্ধুত্ব করো না, কারণ সে তোমাকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে দিবে। মিথ্যাবাদীর সাথে বন্ধুত্ব করো না, কারণ সে তোমাকে দূরের জিনিস কাছে ও কাছের জিনিস দূরে দেখাবে।

১৭) আমার এ তরবারি দ্বারা যদি আমি কোনো ঈমানদারের নাকে আঘাত করি, তবুও সে আমাকে ঘৃণা করবে না। আবার আমাকে ভালবাসার জন্য যদি আমি মোনাফিকের সামনে দুনিয়ার সকল সম্পদ স্তুপীকৃত করে দেই তবুও সে আমাকে ভালবাসবে না। কারণ রাসূল পাক (সা.) বলেছেন, "হে আলী! ঈমানদারগণ কখনও তোমাকে ঘৃণা করবে না। আর মোনাফিকেরা কখনো তোমাকে ভালবাসবে না"।

১৮) ধৈর্য দুই প্রকার, যা তোমাকে পীড়া দেয় তাতে ধৈর্য এবং যা তোমার লালসার সৃষ্টি করে তার বিরুদ্ধে ধৈর্য।

১৯) সম্পদ থাকলে বিদেশেও স্বদেশ মনে হয়। আর দুর্দশা থাকলে স্বদেশেও বিদেশ মনে হয়।

২০) তৃপ্তি এমন এক সম্পদ যা কখনো কমে না।

২১) যে তোমাকে সতর্ক করে সে ঐ ব্যক্তির মতো যে তোমাকে সুসংবাদ দেয়।

২২) জিহবা পশুর মতো একে ঢিলা দিলেই গোগ্রাসে গিলে।

২৩) নারী কাঁকড়ার মতো যার আঁকড়ে ধরা মধুর।

২৪) পৃথিবীর বাসিন্দারা সে সব ভ্রমণকারীদের মতো, যাদের ঘুমন্ত অবস্থায় বহন করা হয়।

২৫) যার বন্ধুর অভাব তাকে আগন্তুক মনে হয়।

২৬) অপাত্রে কিছু চাওয়া অপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিনিসে হারানো সহজতর।

২৭) সামান্য হলেও দান করতে লজ্জাবোধ করো না, কারণ ফিরিয়ে দেয়া তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

২৮) দান দুস্থতার অলংকার আর কৃতজ্ঞতা (আল্লাহর কাছে) সম্পদের অলংকার।

২৯) যা সংঘটিত হওয়ার কথা ভেবেছ, তা না ঘটলে উদ্বিগ্ন হয়ো না।

৩০) চরম ভাবে অবজ্ঞা অথবা অতিরঞ্জিত করা ছাড়া কোনো অজ্ঞ মূর্খ লোক দেখবে না।

৩১) জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা যত বাড়বে বক্তব্য তত কমে যাবে।

৩২) মানুষের প্রতিটি নিঃশ্বাস মৃত্যুর দিকে পদক্ষেপ মাত্র।

৩৩) যখন তুমি কোন হাদীস শোন তখন তা বুদ্ধিমত্তার সাথে পরীক্ষা করো। কারণ হাদীস বর্ণনাকারী জ্ঞানী লোকের সংখ্যা অনেক কিন্তু হাদীসের সঠিকতা রক্ষাকারীর সংখ্যা খুবই কম।

৩৪) কখনো কখনো শিক্ষিত লোকের অজ্ঞতা তাকে ধ্বংস করে দেয়, তখন তার যে জ্ঞান আছে তা লোপ পায়।

৩৫) আহলুল বাইতকে যারা ভালবাসে তাদেরকে অনেক দুঃখ-দুর্দশা, লাঞ্ছণা-বঞ্ছণা, উৎপীড়ন যন্ত্রণা পোহাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

৩৬) দু'শ্রেণির লোক আমাকে নিয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। এক শ্রেণি হলো যারা আমার যেকোনো বিষয় অতিরঞ্জিত করে ফেলে। অপর শ্রেণি হলো যারা আমার সাথে শত্রুতা রাখে ও ঘৃণা করে।

৩৭) যে ব্যক্তি বন্ধুদের তিন সময় রক্ষা করার চেষ্টা করে না সে প্রকৃত বন্ধু নয়। সময়গুলো হলো- তার অভাবের সময়, তার অনুপস্থিতিতে ও তার মৃত্যুকালে।

৩৮) পাপ করে তওবা করার চেয়ে পাপ থেকে বিরত থাকা অতি উত্তম।

৩৯) অবহেলার ফল হচ্ছে লজ্জা আর দূরদর্শীতার ফল হচ্ছে নিরাপত্তা।

৪০) এমনভাবে কথা বলো যেন মানুষ তোমাকে জানতে পারে, কারণ মানুষের স্বরূপ জিহ্বার নিজে লুক্কায়িত।

পরিশেষে এটাই বলবো আমাদের প্রিয় নবীজী জীবনে এক মুহুর্তের জন্যে ও আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছিলেন কি? উত্তর একটাই না। তাহলে পবিত্র কোরআনের সূরা আত্ তাহরীমের ৯নং আয়াতে আল্লাহপাক তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন, **"হে নবী কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম, সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান।"** অথচ সমগ্র দুনিয়া স্বীকৃত নবীজী কখনো তাঁর চাচা আবু তালিবের প্রতি কঠোর ছিলেন না এবং চাচার বিরুদ্ধে জেহাদও করেননি। উপরন্তু এই চাচারই পৃষ্ঠপোষকতায় নবীজী কাফেরদের বিরুদ্ধে অসংখ্য যুদ্ধ করেছেন। সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হযরত আবু তালিব ঈমানদার ও মোমেন ছিলেন। অতএব আমরা যারা মুসলমান যদি পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত আয়াত সমূহ যথাযথ ভাবে মেনে চলার চেষ্টা করি ও মহান মাসুম ইমামগণের দিক নির্দেশনার অনুসরণ করি, তবে নিশ্চিত এইটুকু বলতে পারি যে, আখেরাতে আমাদের বিপদগামী হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই ইন্শাল্লাহ।

ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস ও তথ্য সূত্র উদঘাটনের নিমিত্তে নিম্নোক্ত বইগুলি অধ্যয়ন করা যেতে পারে :

১) চিরভাস্বর মহানবী (সা.), মূলঃ আয়াতুল্লাহ জাফর সুবহানী, অনুবাদঃ মোহাম্মদ মুনীর হোসেন খান
২) নাহ্জ আল-বালাঘা, মূলঃ হযরত আলী ইবনে আবিতালিব, অনুবাদঃ জেহাদুল ইসলাম।
৩) দ্যা স্পিরিট অব্ ইসলাম, স্যার সৈয়দ আমীর আলী।
৪) সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৫) খেলাফত ও রাজতন্ত্র, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী।
৬) কারবালা ও মুয়াবিয়া, সৈয়দ গোলাম মোরশেদ।
৭) মহানবী (সা.) ও তাঁর আহলে বাইত, মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ।
৮) বারো ইমাম এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, সংকলনে : আলী নওয়াজ খান।
৯) ঐতিহাসিক আল-গাদীর, মীর রেজা হুসাইন শহীদ।
১০) নবী বংশ পরিচিতি ও মহান কোরবানি, সৈয়দ মোহাম্মদ ইস্হাক।
১১) নবী (সা.)-এর আহলে বাইত এর অনুসরণ কি অপরিহার্য? -এম. রহমান।
১২) ইতিহাসগত বিভ্রান্তির রহস্য, মোফাখ্খারুল ইসলাম।
১৩) রাছুলুল্লাহ (দ:)-এর ওফাত ও কিছু প্রসঙ্গিক আলোচনা। জালালুদ্দীন উয়ায়ছী।
১৪) আমিও সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে গেলাম, মূলঃ ডঃ মুহাম্মদ তিজানী আল সামাভী। অনুবাদঃ ইরশাদ আহমেদ।
১৫) আহলে যিকিরকে জিজ্ঞাসা করুন, মূলঃ ড. মুহাম্মদ তিজানী আল সামাভী। অনুবাদঃ ইরশাদ আহম্মেদ।
১৬) সত্য বল সুপথে চল, –এ. কে. মনজুরুল হক।
১৭) আমরা কি প্রকৃত সুন্নাহ অনুসরণ করছি? –এম. রহমান।
১৮) বিহারুল আনওয়ার, মূলঃ আল্লামা মাজলিসী, অনুবাদঃ মোহাম্মদ আলী মোর্তজা।
১৯) হাদীসে কিরতাস এবং হযরত উমর (রা:)-এর ভূমিকা, মূলঃ আবদুল করিম মুশ্তাক, অনুবাদঃ ইরশাদ আহমেদ।
২০) উম্মুল মু'মেনিন খাদিজা আত-তাহিরা, মূলঃ সাইয়্যেদ আখতার আলী রিজভী, অনুবাদঃ মোস্তফা কামাল।
২১) নবী নন্দিনী হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.), মূলঃ হযরত আয়াতুল্লাহ আল-উযমা সাইয়েদ মোহাম্মদ হুসাইন ফাযলুল্লাহ (রহ), অনুবাদঃ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান।
২২) ইমাম মাহদী (আ.)-এর আত্মপ্রকাশ (আস্রে যুহুর); মূলঃ আল্লামা আলী আল কুরানী, অনুবাদঃ মোহাম্মদ মুনীর হোসেন খান।
২৩) আল মুরাজায়াত (পত্রালাপ), আল্লামাহ্ সাইয়্যেদ আবদুল হুসাইন শারাফুদ্দিন আল মুসাভী, অনুবাদঃ আবুল কাসেম।
২৪) আল মুরতাজা, মূল সাইয়্যেদ আলী জাফরী, অনুবাদ কাজী মাসুম।

AhlulbaytBanglaBooks.wordpress.com,By:AwliyaLink1214@gmail.com

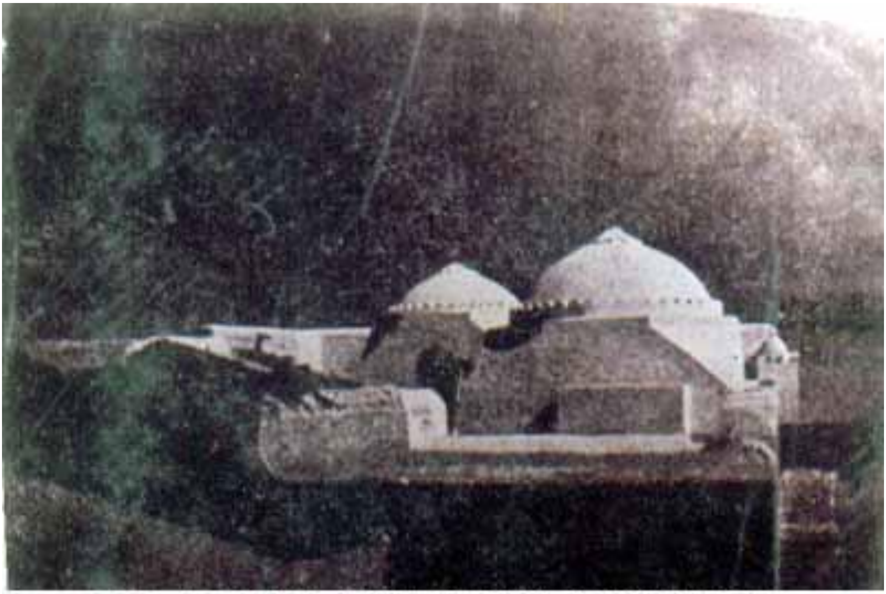

ROZA-E-HAZRAT ABDUL MUTALIB &
HAZRAT ABU TALIB (BEFORE DESTRICTION)
MACCA

১৯২৫ সালে আল-সৌদ রাজ পরিবার মক্কা-মদিনা দখলের পর সালাফি-ওহাবীদের ফতোয়ায় যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় হযরত আবু তালিবের এই মাজার শরিফও রক্ষা পায়নি। তা আজ শুধুই স্মৃতির এ্যালবামে ঠাঁই পেয়েছে।

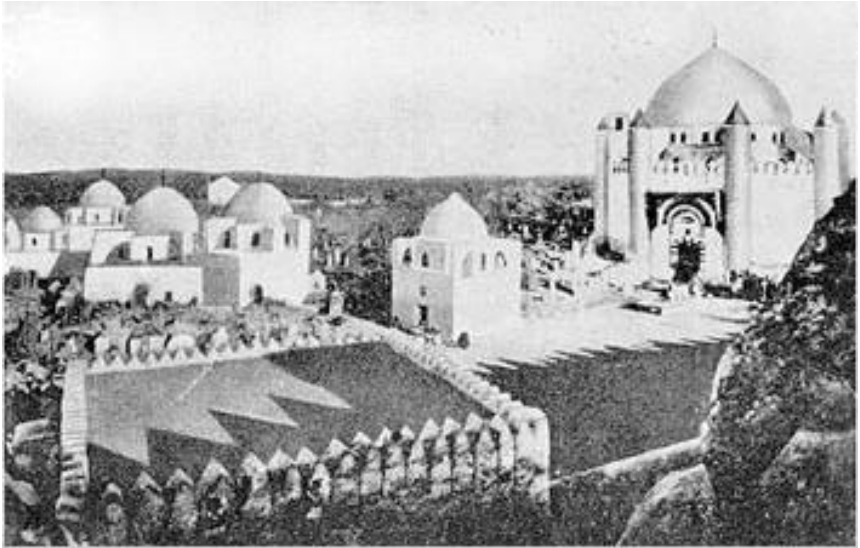

Jannatul Baqi - Before the demolition of 1925, by King Ibne Saud

১৯২৫ সালে আল-সৌদ রাজ পরিবার মক্কা-মদিনা দখলের পর সালাফি-ওহাবীদের ফতোয়ায় যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় রাসূল (সা.)-এর পবিত্র আহলে বাইত ও সন্মানিত সাহাবাগণের রওজা শরিফও রক্ষা পায়নি। তা আজ শুধুই স্মৃতির এ্যালবামে ঠাঁই পেয়েছে।

AhlulbaytBanglaBooks.wordpress.com,By:AwliyaLink1214@gmail.com

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ . . .

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিদায় হজ্জের শেষ ভাষণ
–আল্লামা আবু মনসুর আহ্‌মদ ইবনে আলী আত-তাবারসী (রহ.)

উম্মুল মু'মেনিন খাদিজা আত-তাহিরা (রা.)
[অপরিশোধযোগ্য এক ঋণ]
– সাইয়্যেদ আখতার আলী রিজভী

কারবালা ও ইসলাম
[ইসলামে বিভাজনের নেপথ্য]
– সৈয়দ গোলাম আসকারী

আশার আলো ইমাম মাহ্‌দী আলাইহিস সালাম
–ওয়াজহুল ক্বামার খান বাস্তাবী

আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ও অন্যান্য কল্পকাহিনি
– আল্লামা সাইয়্যেদ মুরতাযা আসকারী

ইমাম হাসান ও খেলাফত

[ইতিহাসের অব্যক্ত অধ্যায়]
–মোস্তফা কামাল

যয়নাব বিনতে আলী
[ইসলামের পুনর্জীবন দানকারিণী]
– আবু তালেব আত-তাবরিযী

আবুল ফজল আব্বাস
[কারবালায় ইসলামের পতাকাবাহী]
– আবু তালেব আত-তাবরিযী

Notes :

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Notes :

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………